ভাষা শহীদ অমর রহে

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

নবম ও দশম সংস্করণ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২২ ■ ৪৯তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

৮ই মার্চ, ২০২২

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ৮ মাচ ২০২২ মঙ্গলবার কলকাতার কর্মচারীভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে একটি আলোচনা সভা সংগঠিত হয়। সভায় মূল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় ছাত্র আন্দোলন তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী দীপ্সিতা ধর। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ সভানেত্রী গীতা দে এবং কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অপর দুই সদস্য দেবলা মুখার্জী ও শাশ্বতী মজুমদার।

দীপ্সিতা ধরকে সংবর্ধনা

দীপ্সিতা ধর

আলোচনা সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ বলেন ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন কোনো আনুষ্ঠানিক বিষয় নয়, নারীদের বহু লড়াই আন্দোলনের ফসল এই বিশেষ দিনটি। ১৯০৮ সালে নিউইয়র্ক শহরে দর্জি কারখানার মহিলা শ্রমিকদের ভোটাধিকারের প্রশ্নে লড়াই ৮ মার্চ শুরু হয়। বহু লড়াই আন্দোলনের ফলে পরবর্তীতে ভোটাধিকার স্বীকৃতি পায়। তারও আগে আমরা দেখেছি ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পুরুষদের সঙ্গে একযোগে মহিলাদের লড়াই, প্যারি কমিউনের সময় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মহিলাদের লড়াই,

বিজয় শংকর সিংহ

সুতপা হাজরা

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

৫-৬ মার্চ, ২০২২ মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত হল জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা। ১৯টি রাজ্যের ২১টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মধ্যপ্রদেশ তৃতীয় বর্গের কর্মচারী সংগঠনের (Class-III Employees Association. M.P) ব্যবস্থাপনায় এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিন ব্যাপী এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান সুভাষ লম্বা সহ অন্যান্য ভাইস-চেয়ারম্যানগণ। সভায় প্রাথমিক প্রস্তাবনা করেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। আলোচনা মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ সাধারণ ধর্মঘট এবং বিহারের বেগুসরাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৩-১৬ এপ্রিল ১৭তম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি বিষয়ে। সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনার উপর ২১টি সংগঠনের ২১ জন এবং মহিলা কনভেনশনে ৯ জন মহিলা বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিন্‌হা বক্তব্য রাখেন। মহিলা অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন সুতপা হাজরা। সকলের বক্তব্য শেষে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। শ্রীকুমারের বক্তব্যের হিন্দি অনুবাদ সহ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঐ সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন বিজয় শংকর সিন্‌হা, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সুতপা হাজরা। উক্ত সভা থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ ঃ

❑ ২৮-২৯ মার্চ দু'দিন ব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের প্রচার জোরদার করতে হবে। রাজ্যের প্রত্যেকটি জেলা থেকে ব্লক স্তর এবং রাজধানীর প্রতিটি অফিসে লিফলেট, পোস্টার এবং বেশিরভাগ কর্মচারীর অংশগ্রহণের দ্বারা মিছিল ও বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। ১১ মার্চ দেশের সর্বত্র একযোগে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করতে হবে।

❑ সুকোমল সেন ভবন ঃ (i) ভবনের লাইব্রেরির নামকরণ হবে ''শ্রীরামালু পুস্তকালয়'' (ii) ভবনের সম্মেলন কক্ষের নামকরণ হবে ''অরবিন্দ ঘোষ সম্মেলন কক্ষ'' (iii) মিটিং হল-এর নামকরণ হবে ''আর মুথুসুন্দরম কক্ষ''। (iv) ফেডারেশন গঠনকারী নেতাদের চিত্র ভবনে লাগানো হবে। (v) সুকোমল সেন-এর আবক্ষ মূর্তি ভবনের সামনে বসানো হবে।

❑ পুরনো সম্মেলনগুলির নথিপত্র ঐ ভবনে সংগ্রহ করা হবে।

❑ চণ্ডীগড়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সংযুক্ত মোর্চা গঠন করে চলতি আন্দোলনে আরও গতি আনতে হবে।

❑ মধ্যপ্রদেশ, গোয়া, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে সংগঠনগুলির আন্তঃসমস্যার কারণে ফেডারেশন দুর্বল হয়েছে।

❑ পাঞ্জাব, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড ও গোয়াতে স্ব স্ব সংগঠনের রাজ্য সম্মেলন করে নিতে হবে।

❑ ফরিদাবাদে নতুন ভবন থেকেই এমপ্লয়িজ ফোরামের হিন্দি সংস্করণ প্রকাশিত হবে।

❑ ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস সমস্ত রাজ্যে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালন করতে হবে।

❑ সংগঠনের সংবিধানে কিছু সংশোধনী আনা হবে।

(i) সংগঠনের চেয়ারম্যান আগামীদিনে প্রেসিডেন্ট হিসাবে গণ্য হবেন। একইভাবে ভাইস-চেয়ারম্যানরা ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে। (ii) সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ এতদিন পর্যন্ত মনোনীত হতেন— সংশোধনের মাধ্যমে এবার থেকে তিনি নির্বাচিত হবেন।

❑ ১৭তম জাতীয় সম্মেলন কিভাবে অনুষ্ঠিত হবে তা পৃথকভাবে দিয়ে দেওয়া হল।

(i) সম্মেলনের এজেন্ডা প্রস্তাব (ii) প্রতিনিধিদের নাম ২০ মার্চের আগেই ই-মেল মারফৎ জানিয়ে দিতে হবে। (iii) প্রতিনিধিরা ১৩ এপ্রিল সকালে আসবেন ও ১৬ তারিখ রাতের মধ্যে আবাসন স্থল পরিত্যাগ করবেন। (iv) সম্মেলনের প্রতিনিধি ফি ২০০০ টাকা। (v) ১৩ তারিখ মিছিলে প্রত্যেক সংগঠন তাদের নিজেদের সংগঠনের নামাঙ্কিত পতাকা / ব্যানার নিয়ে আসবেন। (vi) প্রত্যেক প্রতিনিধি বৈধ পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখবেন। (vii) রাজ্যগুলি জাতীয় সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে ৫ এপ্রিল নিজ নিজ কেন্দ্রীয় দপ্তরে এ আই এস জি ই এফ-এর পতাকা উত্তোলন করবে। (viii) ৮ এপ্রিল রাজ্যের রাজধানীগুলিতে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে কর্মচারীদের মুখ্য দাবিগুলো প্রচারে আনতে হবে। (ix) সম্মেলন স্থলের নামকরণ ঃ আর জি কার্ণিক নগর, আর সি জঙ্গা গেট (এনহাস লাইন এন্ড রিসর্ট)। জনসভা—অজয় মুখোপাধ্যায় নগর (গান্ধী স্টেডিয়াম)।

❑ ১ এপ্রিল ২০২২ ব্যাঙ্গালোর থেকে সংগঠনের ফেসবুক ও টুইটার একাউন্ট শুরু করা হবে। ❑

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

রাজ্য সরকারের মদতে সক্রিয় প্রোমোটার চক্র

বিলুপ্ত হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী বি জি প্রেস ও তার হেরিটেজ বিল্ডিং

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস বা বি জি প্রেস শুধুমাত্র একটি প্রিন্টিং প্রেস নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিবিজরিত শতাব্দী প্রাচীন এই প্রেসটি স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশের এবং স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি মুদ্রণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে বর্তমান ঠিকানায় (গোপাল নগর, আলিপুর) এই প্রেসের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৩৬ সালে এর আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়। সেই সময় থেকেই ৪৫০ হাজার রয়্যাল অক্টাভো সাইজের কোনো বই একদিনের মধ্যে কম্পোজ, প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং করে ডেলিভারি করার ক্ষমতা অর্জন করে বি জি প্রেস। তখন বিশ্বের মাত্র ৩/৪টি প্রেসের এই ধরনের অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি ছিল। প্রতিষ্ঠানের মতোই বিপুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বছরটিতেই দাবি আদায়ের জন্য মাসাধিককাল ধর্মঘট করেন এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এটাই ছিল এদেশে সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘট। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ এই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গত শতাব্দীর উত্তাল চল্লিশের দশকে দাবি আদায়ে পুণরায় ধর্মঘটে যান এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। দাবি আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি, এই প্রেসটিকে এশিয়ার সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসের মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রেও এখনকার শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের উদাহরণযোগ্য ভূমিকা পালন পরেন। শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্‌ফর আহমেদও কিছুদিন এই প্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই প্রেসটিকে 'হেরিটেজ' মর্যাদায় ভূষিত করে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়।

কিছুদিন আগেও এই প্রেস থেকে লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৬/৭ কোটি ব্যালট পেপার ছাপা হতো। এক রাতের মধ্যে রাজ্য বাজেটের সাড়ে সাত-হাজার পাতার বই ছাপতে পারত এই প্রেস। অথচ ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় বিমাতৃসুলভ আচরণ। স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ার ফলে কমতে থাকে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা। ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বার বার দাবি করা সত্ত্বেও প্রেসের আধুনিকীকরণ বা পর্যাপ্ত কাজ বরাদ্দ করা কোনোটিই হয়নি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকার মধ্যে এই প্রেসটির অবস্থান। অথচ ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

ডি এ কাকে বলে জানেই না এই সরকার

ডি এ দয়ার দান নয়

গত ১১ মার্চ, ২০২২ মুখ্যমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য প্রাপ্য ডি.এ নিয়ে মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা ও ধিক্কার জানাচ্ছি। অল ইন্ডিয়া প্রাইস ইনডেক্স অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য বেতনের যে ক্ষয় হয় তা পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার ডি.এ ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত নীতির জন্যই এই চরম মূল্যবৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ তারাই মূলতঃ দায়ী। ডি.এ কোনো দয়ার দান নয়। কর্মচারী সমাজের ন্যায্য অধিকার। আমরা মনে করি সরকারের পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করা হয়েছে। সারা দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা আপ-টু-ডেট ডি.এ পাচ্ছেন, আমরা কেন পাব না। রাজ্য প্রশাসনে সাড়ে পাঁচ লক্ষ্য শূন্যপদ, লক্ষাধিক চুক্তি ও এজেন্সি প্রথায় নিয়োগ করে চরম শোষণ বঞ্চনা চলছে। বেতনের বোঝা বইতে হচ্ছে না। অথচ ডি.এ দেওয়া যাচ্ছে না। এদিকে উৎসব, মচ্ছব, খেলা, মেলা, কার্নিভাল সব চলছে ও হরিলুটের মতো লুটের রাজ চলছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের পক্ষে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য কর্মচারী সমাজ মানতে পারছে না, তারা অপমানিত বোধ করছে। তাই কর্মচারীদের বকেয়া ২৮ শতাংশ ডি.এ অবিলম্বে দেওয়ার দাবিতে, নিজেদের আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে কর্মচারী সমাজ আগামী ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ রাজ্য সরকারকে দাবি আদায়ে বাধ্য করতে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটে সামিল হবে।

বিজয় শঙ্কর সিংহ

(বিজয় শঙ্কর সিংহ)
সাধারণ সম্পাদক
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সম্পাদকীয়

ধর্মঘট, মধ্যবিত্ত ও আমরা

নয়া উদারবাদী অর্থনীতি বিভিন্ন ধরনের পোশাকি নামের আড়ালে, ১৯৯১ সাল থেকে এদেশের বুকে গুটি গুটি পায়ে পথ চলা শুরু করে। আমজনতার সেই সময় নয়া উদারবাদ সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুব স্বাভাবিক কারণেই ছিল না। মানুষের এই অনভিজ্ঞতার সুযোগটা পুরোদমে কাজে লাগিয়েছিল মিডিয়া। তাদের প্রচারের মূল সুরটা ছিল এইরকম—'যা হচ্ছে তা ভালোর জন্যই হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত যা ছিল অধরা মাধুরি, এবার তা ধীরে ধীরে হাতের নাগালের মধ্যে চলে আসবে।' বস্তুতপক্ষে মেইন স্ট্রীম মিডিয়ার বড় অংশ সেই সময় থেকেই তাদের স্বাধীন চরিত্র সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে কর্পোরেট লবির পক্ষে আদাজল খেয়ে ওকালতি শুরু করে। অস্বীকার করার উপায় নেই, মিডিয়ার এই কৌশলী প্রচার সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছিল সমাজের উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত অংশকে। আসলে যেমন আছি, তার থেকে আরও ভালো থাকার আকাঙ্ক্ষ, আর্থ-সামাজিক সিঁড়ির যে ধাপে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে চোখ তুলে ওপরের ধাপগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা, নিচের ধাপগুলোতে যারা রয়েছে, জীবন যাপনের বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা মধ্যবিত্তর মানসিক গড়নের সহজাত বৈশিষ্ট্য। তবে নিজস্ব 'লাইফ স্টাইল'কে কেতাদুরস্ত করার এই আকাঙ্ক্ষা যত তীব্রই হোক না কেন, মধ্যবিত্ত স্বেচ্ছায় এতে সামাজিক মূল্যবোধের লাগাম পরিয়ে রাখতে জানত।

এই লাগামটাকে ধরেই সজোরে টান মারল নয়া উদারবাদের তল্পিবাহক 'ভোগবাদ'। উন্নত প্রযুক্তির গর্ভজাত 'ফরেইন প্রোডাক্টে'র স্রোতে ভেসে যাওয়া বাজার দেখে আহ্লাদে আটখানা হল মধ্যবিত্তের মন। বিদেশী পণ্য মানেই তা গুণমানে উন্নত, এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা মধ্যবিত্তের আগেও ছিল। কিন্তু তখন বিদেশী পণ্যের সংখ্যা ছিল হাতে গোণা এবং তেমনভাবে সুলভ ছিল না। নয়া উদারবাদ তথা বিশ্বায়ন এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করার 'সুযোগ' এনে দিল। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হল, মধ্যবিত্তের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করার 'সুযোগ' এনে দিলেও, প্রয়োজনীয় 'উপায়'-এর সন্ধান কিন্তু তেমনভাবে দিল না। তথ্য-প্রযুক্তির মতো কর্ম সংস্থানের নতুন নতুন কিছু ক্ষেত্র তৈরি হলেও, সামগ্রিক প্রয়োজনের নিরিখে তা ছিল সামান্যই। তবুও একথা বলা অত্যুক্তি হবে না, বিশ্বায়ন উচ্চমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্তের জীবন দর্শন অনেকটাই বদলে দিয়েছিল।

মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যন্তরে এই আলোড়নটা নয়া উদারবাদের প্রয়োজনও ছিল। কারণ এদেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশের মোট জনসংখ্যার থেকেও তা অনেকটাই বেশি। যে উন্মুক্ত বাজার নয়া উদারবাদ তৈরি করে, সেখানে বিকি-কিনির ক্রয় ক্ষমতাসম্পন্ন মধ্যবিত্তকেই দরকার। তাই শুরু থেকেই মধ্যবিত্ত ছিল 'টার্গেট গ্রুপ'।

এতদ্‌সত্ত্বেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, নয়া উদারবাদ বিরোধী প্রথম ধর্মঘট (১৯৯১) থেকেই মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক জাতীয় ফেডারেশনগুলিও তাতে অংশ নিয়েছে। ঠিক যে সময়ে, খুব ধীরে হলেও, মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যন্তরে নয়া উদারবাদ কেন্দ্রীক প্রচার আশা ভরসার জমি তৈরি করছে, সেই সময়েই নয়া উদারবাদের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে ধর্মঘটে শামিল করানোর কাজটা খুব সহজ ছিল না। কারণ এই পরস্পরবিরোধী প্রচারের একদিকে ছিল বিপুল ভেদশক্তি সম্পন্ন গণমাধ্যম, অপরদিকে ছিল সংগঠিত প্রচার আন্দোলনে ব্যবহৃত ট্র্যাডিশনাল কিছু মাধ্যম—যেমন, মিছিল, স্কোয়াড, পথসভা, লিফলেট, মুখপত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ একদিকে ছিল বিপুল পরিমাণ পুঁজি ও উন্নত প্রযুক্তির যৌথ শক্তি, অপরদিকে ছিল অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সম্মিলিত প্রয়াস। একদিকে ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্যকে আড়াল করে একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার হীন প্রচেষ্টা। অপরদিকে ছিল সেই মিথ্যার জালকে ছিন্ন করে প্রকৃত উদ্দেশ্যটাকে উন্মোচিত করার দায়বদ্ধতা। এই প্রচার যুদ্ধেরত দুই পক্ষেরই কয়েকটি সুবিধার দিক, আবার কয়েকটি অসুবিধার দিকও ছিল। কোন পক্ষের কোনটি সুবিধার দিক, আবার কোনটিই বা অসুবিধার দিক, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে হলেও আলোচনা শুরু করার আগে, আলোচনার সুবিধার্থে 'মিডিয়া' এবং 'সংগঠিত উদ্যোগ' এইভাবে দু'পক্ষের নামকরণ করে নিতে পারি।

নয়া উদারবাদের পথচলার একেবারে শুরুর দিকে, মিডিয়ার মধ্যবিত্তকে প্রভাবিত করার কাজটা অনেকটাই সহজ ছিল। কারণ, সেই সময় তথাকথিত সংস্কার প্রক্রিয়া যা শুরু হয়েছিল, যাকে 'প্রথম প্রজন্মের সংস্কার' নামে অভিহিত করা হয়েছিল, তা ছিল মূলত শিল্পসংস্থাসমূহের চরিত্র বদল করার প্রয়াস। অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ধীরে ধীরে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কায়িক শ্রমের প্রয়োজনীতাকে হ্রাস করা। ফলে ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্ত, যারা মূলত বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত, তারা তখনও আক্রমণের বৃত্তের মধ্যে আসেনি। স্বভাবতই শিল্পসংস্থার শ্রমিক-কর্মচারীরা যে বিপদের ঘণ্টা শুনতে পাচ্ছিল, পরিষেবা ক্ষেত্রের কর্মচারীদের কানে তখনও সেই আওয়াজ পৌঁছোয়নি। দ্বিতীয়ত, শ্রম নিবীড়তার পরিবর্তে প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই রূপান্তর, শিল্পসংস্থাগুলিকে ঘিরে এক ধরনের ম্যানেজেরিয়াল কাজের প্রসার ঘটালো। ক্রমপ্রসারমান নয়া ম্যানেজেরিয়াল কাজে মধ্যবিত্তের একটা অংশ যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেল। পাশাপাশি প্রযুক্তি নিজেই নতুন নতুন কিছু ক্ষেত্র তৈরি করল (যেমন আই টি সেক্টর) যার কোনো অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। এই নতুন ক্ষেত্রগুলিও মধ্যবিত্তের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিল। শুধু যে নতুন সুযোগ এল তাই নয়, এক ভিন্ন ধরনের পরিবেশ, আদব-কায়দা তো ছিলই, এমনকি শুরুর দিকে 'পে-প্যাকেজও' ছিল বেশ লোভনীয়। বহু অধিকার সম্বলিত 'সার্ভিস রুলস'-র পরিবর্তে এমপ্লয়ার আর এমপ্লয়ির মধ্যে থাকল এক নতুন ধরনের চুক্তিপত্র। যেখানে 'অধিকার' নিষিদ্ধ শব্দ। একমাত্র স্বীকৃত বিষয় হল 'মানসিক শ্রম'-এর মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি।

নয়া উদারবাদ সৃষ্টি 'নিও মিডল ক্লাস'কে তুষ্ট করার জন্য আমদানি নীতির পরিবর্তন করে যেমন বাজারে ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা হল, তেমনি এই অংশের মানসিক বশ্যতা আদায় করার জন্য 'বিরাজনীতিকরণের' পরিকল্পনাকেও সুকৌশলে লাগু করা হল। মধ্যবিত্তের অভ্যন্তরে এই নতুন অংশ পুরোনো অংশের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও, মিডিয়া যা পারল তা হল, নয়া মধ্যবিত্তের জীবন দর্শনের প্রতি ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তও আকর্ষিত হতে শুরু করল। এর ফলে ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্ত নিও মিডলক্লাসের জীবন দর্শনকে অনুকরণ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় নিজস্ব পছন্দ, রুচি, কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন ঘটাতে লাগল। রাজনীতি, যা ছিল তার সহজাত চর্চার বিষয়, তা থেকেও স্বেচ্ছায় দূরত্ব তৈরি করা ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তেরও 'ফ্যাশন'-এ পরিণত হল। এগুলি যেমন ছিল 'মিডিয়া'-র সুবিধার দিক, তেমনই এগুলিই ছিল 'সংগঠিত উদ্যোগ'-এর অসুবিধার দিক। এতদসত্ত্বেও, শুরুর দিকে ধর্মঘটগুলিতেও মধ্যবিত্তের একটা বড় অংশ বিভিন্ন ফেডারেশনের নেতৃত্ব যে অংশগ্রহণ করেছে, তার কারণ ঐ সংগঠনগুলির অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা। এগুলিকে পুঁজি করেই তারা মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রচার করেছে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল গত শতাব্দীর আশির দশকে লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যবিত্তের দুরাবস্থার কথা। কারণ লাতিন আমেরিকাই ছিল নয়া উদারবাদের প্রথম পরীক্ষাগার।

সংস্কার প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ বা দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারে হাত পড়ে পরিষেবাক্ষেত্রে। বিভিন্ন কমিটি বা কমিশন গঠন করে ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তের আঁতুরঘর পুরোনো পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে 'পেপারলেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'-এর নামে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়। কম্পিউটারাইজড্ ই-পরিষেবা, অটোমেশন ইত্যাদি অপরিচিত বিষয়ের মুখোমুখি হতে হয় ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তকে। এই পরিবর্তনকে 'অ্যাডপ্ট' করার চেষ্টা, না পারলে 'ব্যাকডেটেড' চিহ্নিত হওয়া জনিত হীনমন্যতা, পেশার বাইরে বি-রাজনীতিকরণের ফাঁদে ইতিমধ্যে অনেকখানি পা দিয়ে ফেলা, ভোগ্যপণ্যের প্রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তীব্র আকর্ষণ ইত্যাদি বহুবিধ উপাদানের টানাপোড়নে বিঁধতে থাকে মধ্যবিত্ত মানস। এই পর্বে উক্ত সমস্ত ধরনের টানাপোড়েন থেকে মধ্যবিত্ত সমাজকে বের করে এনে, ধর্মঘট সহ লড়াইয়ের ময়দানে শামিল করার জন্য সংগঠিত উদ্যোগ এবার ব্যবহার করে শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাকে (প্রথম প্রজন্মের সংস্কারের বিষময় ফল)। লাতিন আমেরিকার অভিজ্ঞতার তুলনায় ঘরের পাশের এই অভিজ্ঞতা অনেক বেশি প্রভাবিত করে মধ্যবিত্তকে। সাধারণ ধর্মঘটগুলিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের শ্রমিক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, এমনকি ক্ষেত্রভিত্তিক ধর্মঘটের প্রস্তুতিও শুরু হয়।

তৃতীয় ধাপে এল, পরিষেবা ক্ষেত্রের সরাসরি বেসরকারীকরণের প্রস্তাব, স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে চুক্তি প্রথায় নিয়োগ, স্থায়ী পদের বিলুপ্তি, অর্জিত অধিকার হরণের পালা। ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্ত যখন এই সমস্ত আক্রমণ সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে, তখন নয়া উদারবাদ নিজেও সঙ্কটের ধাক্কায় বিপর্যস্ত। ফলে 'নিওমিডল ক্লাস'-এর আঁতুর ঘর পরিষেবার আধুনিক ক্ষেত্রগুলিও সমস্যায় পড়ল। এতদিন পর্যন্ত সংগঠন আন্দোলন সম্পর্কে উন্নাসিক এবং উদাসীন নয়া মধ্যবিত্ত জোট বাঁধার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শুরু করল। এই পর্বে সংগঠিত উদ্যোগ পূর্বের দুটি পর্বে যে অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছিল, তা যে মিলে যাচ্ছে, জোরদার প্রচারের মাধ্যমে তা তুলে ধরার প্রচেষ্টা গ্রহণ করল। এই পর্বে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের হারই শুধু বৃদ্ধি পেল তা নয়, অংশগ্রহণের বৃত্তটাও বড় হল। পেশাগত ক্ষেত্রে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ডি-পলিটিশাইজড্ মধ্যবিত্তকে আবার রাজনৈতিক চর্চার পরিমণ্ডলে ফিরিয়ে আনেছ লক্ষ্য করে, নয়া উদারবাদ এবার মধ্যবিত্তের জোট বাঁধার প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরিচিতি সত্তার রাজনীতিকে আসরে হাজির করল। জাত-পাত ভিত্তিক বিভাজন ও ধর্মীয় মেরুকরণের আগুন নিয়ে খেলাকে মদত দিতে শুরু করল নয়া উদারবাদ। এই পর্বে সংগঠিত উদ্যোগ তার বক্তব্যে সরাসরি রাজনীতির কথাই বলল। শুধু নিজের পেশাগত ক্ষেত্রকে রক্ষা করাই নয়, দেশের জনগণ ও সংবিধানকে রক্ষা করার ডাক দেওয়া হল। আসন্ন ২১তম ধর্মঘটের পরিপূর্ণ প্রেক্ষিত এটাই।

দীর্ঘ তিন দশকব্যাপী এই টানাপোড়েনের বাইরে পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদেরও থাকার কথা নয়। মিডিয়া প্রচার যেমন এরাজ্যেও অতি সক্রিয় ছিল, তেমনই সংগঠিত উদ্যোগের পাল্টা প্রচারও বরং বহু রাজ্যের তুলনায় বেশিই ছিল। তবুও নয়া উদারবাদের প্রথম দু'দশকে (১৯৯১-২০১১) এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের ছত্রছায়ায় থাকা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের কাছে সংগঠিত উদ্যোগের পাল্টা প্রচারকে নিজ অভিজ্ঞতার সাথে মেলানোর কার্যত কোনো সুযোগ ছিল না। ফলে এই প্রচারকে অনেকাংশেই কেতাবি বুলি মনে হয়েছে। তাই ঐ সময়কালে ধর্মঘটে অংশগ্রহণের হার প্রায় একশো শতাংশ হলেও, ধর্মঘটীদের একশো শতাংশই ধর্মঘটের তাৎপর্য অনুধাবন করে ধর্মঘট করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। অনুকূল বাতাবরণে ধর্মঘটের প্রতি 'ক্যাজুয়াল অ্যাপ্রোচ' ধর্মঘটকে করে তুলেছিল একটি অতিরিক্ত ছুটির দিন। এমনকি ঐ সময় পর্বের শেষ কয়েকটা বছরে নিজ স্বার্থের পরিপন্থী ধর্মঘট বা বন্‌ধকেও ছুটি হিসেবে পালন করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। ২০১১ উত্তর সময়ে ধর্মঘটের তাৎপর্যকে লঘু করে দেখতে অভ্যস্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ওপর যখন শাসকের আক্রমণের খাঁড়া নেমে আসতে উদ্যত হল, তখন এহেন পরিস্থিতির মোকাবিলার অনভ্যস্ত শিথিল চেতনা, প্রয়োজনের তাগিদে টানটান হয়ে উঠল না। ফলে এ রাজ্যে পাল্টা প্রচারের নেতৃত্বদায়ী রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ঐ শিথিল চেতনাকে টান টান করার অবিরাম প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হল।

আসন্ন ২১তম ধর্মঘটকে কেন্দ্র করেও সেই প্রচেষ্টা জারি রয়েছে। এবারের প্রচেষ্টা অতীতে তুলনায় অধিক ফলদায়ী হবার সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছে। কারণ এতদিনে পেশাগত নিশ্চয়তায় টান পড়েছে। চারপাশে যাই ঘটুক, আমরা বেশ ভালোই আছি—এই সুখানুভূতিও ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে। ফলে বিরাজনীতিকরণ, ভোগবাদ, নয়া মধ্যবিত্ত সুলভ জীবন দর্শন ইত্যাদি চেতনার ওপর স্তরে স্তরে জমে থাকা ধুলো ঝেড়ে, গা ঝাড়া দিয়ে ওঠার উপযুক্ত সময় এটাই। কতটা সম্ভব হল তার পরীক্ষা হবে আগামী ২৮-২৯ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটে।

পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকারী কর্মচারী বন্ধুরা যাতে সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষের মনে সম্ভ্রম জাগানো ভূমিকা পালন করতে পারে—সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই প্রচারের ময়দানে নেমেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং তার অন্তর্ভুক্ত ও সহযোগী সংগঠনগুলি। সাফল্যের ভিকট্রি স্ট্যান্ডে পৌঁছনোর এই সংগ্রামে আসুন আমরা সকলেই শামিল হই। □

১৯ মার্চ, ২০২২

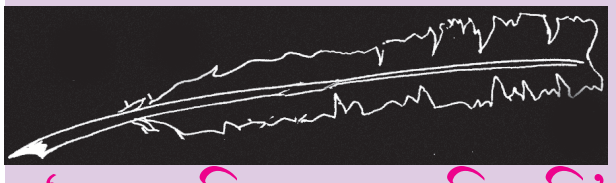

'অলরেডি অনেক দিয়েছি'

মদীয় প্রদেশের একমেবাদ্বিতীয়ম প্রশাসনিক প্রধান সম্প্রতি বিধানসভায় সাংবাদিককুলের মহার্ঘভাতা সংক্রান্ত নাছোড়বান্দা প্রশ্নের জবাবে, কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, 'অলরেডি অনেক দিয়েছি'। এহেন একটি 'সত্য' ভাষণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থ হইয়া রাজ্য সরকারী কর্মীগণ অহেতুক ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অপেক্ষা অধিক 'সত্য' তিনি অতীতে কখনোই উচ্চারণ করেন নাই। সাংবাদিকগণ মহার্ঘভাতার ন্যায় একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে সঙ্কীর্ণ অর্থে প্রশ্নটি উত্থাপন করিলেও, তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভিত্তি করিয়া ইহার জবাব দিয়াছেন। প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গীর কথা শুনিয়া, পাঠকবন্ধুরা দয়া করিয়া বিস্মিত হইবেন না। যিনি রাজ্যের পুষ্করিণী হইতে বাহির হইয়া, দেশের নদীতে সাঁতার কাটিবার জন্য বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত না হইলে উত্তরপ্রদেশ হইতে গোয়া পর্যন্ত কী করিয়া পৌঁছাইল? এই সরল সত্যটি বুঝিতে অক্ষম রাজ্য কর্মীগণ ঘটা করিয়া বিক্ষোভও প্রকাশ করিলেন! ছিঃ।

যিনি দেশের মঙ্গলার্থে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া, সুযোগের সন্ধানে ইতি-উতি ছুটিতেছেন এবং একই সাথে রাজ্যবাসীর হিতে নিবেদিত রহিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় একজন কর্মবীরকে মহার্ঘভাতার ন্যায় একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে বিব্রত করা যে ঘোর অন্যায় হইয়াছে, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। যে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধু এই 'অপরাধটি' করিয়াছেন, তাঁহাদের পরম সৌভাগ্য যে এমন বেয়ারা প্রশ্ন করিবার পরেও তাঁহাদের 'মাওবাদী' তকমা জোটে নাই। এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে অনুরূপ ভুলের পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য সম্মিলিত উপায়ে তাঁহার বক্তব্যের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে, রাজ্যবাসী, বিগত এক দশকে অলরেডি কী কী পাইয়াছেন, তাহার তালিকা আমরা প্রস্তুত করিতে পারি। তালিকার দৈর্ঘ্য দেখিলেই আমরা 'অনেক দিয়েছি'র তাৎপর্য অনুধাবন করিতে সমর্থন হইব।

তালিকার উপযুক্ত শিরোনামটি হইতে পারে 'অনেক দিয়েছিল ফর্দ'। তালিকার প্রথমেই আসিবে 'কর্মসংস্থান'। বিগত দশ বৎসরে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতির বহর যোগ করিলে যে সংখ্যাটি আসিবে, তাহাতে রাজ্যের সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীগণের সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান হইবার পরবর্তীতে অন্যান্য প্রদেশ হইতে লোক ধরিয়া আনিয়া চাকরি দিবার কথা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আসিবে মূল্যবৃদ্ধির প্রসঙ্গটি। সত্যই এক্ষেত্রে বিস্তর টাস্ক-ফোর্স গঠিত হইয়াছে। টাস্ক-ফোর্সের সদস্যগণ বাজার হইতে বাজারে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন। শাক-সবজি, ফল-মুল, মাছ-মাংস হাত দিয়া টিপিয়া টিপিয়া পরখ করিয়াছেন। ফল কি হইয়াছে? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তৃতীয়ত কৃষি। কৃষক বন্ধুরা হইলেন মাটির সহিত সম্পর্কিত মানুষ। অতএব মাটি ও মানুষের (+মা) প্রতি দায়বদ্ধতার কারণে এতটাই অতিরিক্ত কৃষকরা পাইয়াছেন যে অনেকেই আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। চতুর্থত এবং সর্বাধিক যা রাজ্যবাসী ভোগ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, তাহা হইল গণতন্ত্র। কার্যত গণতন্ত্রের একটি 'কম্বো' প্যাক রাজ্যবাসীকে উপহার দেওয়া হইয়াছে। এই কম্বো প্যাকে রহিয়াছে 'ভোট লুণ্ঠন', 'প্রতিবাদী কণ্ঠ দমন', 'শারীরিক নিগ্রহ', 'মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো', বিরোধী রাজনীতির পরিসর সঙ্কোচনে খুন, লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ, পুলিশ প্রশাসনের ক্ষেত্র বিশেষে অতিসক্রিয়তা এবং ক্ষেত্রবিশেষে অতিনিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চমত, নারীর সম্মান। পার্টস্ট্রীট, কামদুনি, মধ্যমগ্রাম, উত্তরবঙ্গের চা-বাগান—ধর্ষিতা নারীর তালিকা সত্যই দীর্ঘ। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এই মূল তালিকার সহিত 'বোনাস' হিসাবে রহিয়াছে প্রশ্ন ফাঁস ও গণটোকাটুকির সংস্কৃতি ফিরাইয়া আনা, করোনাকালে কো-মবিডিটির কিম্ভূত তথ্য, চিকিৎসক ও পরিকাঠামো বিহীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের অট্টালিকা, শিক্ষাবিহীন বিদ্যালয়, গণপরিবহনে বিনিয়ন্ত্রিত ভাড়া নির্ধারণ প্রভৃতি।

'অনেক দিয়েছি'র এ পর্যন্ত উল্লিখিত তালিকাটি হইল, জনসাধারণের স্বার্থে। কিন্তু জনগণের মধ্যে যে অংশটি তাঁহার অনুগামী, সেই সংরক্ষিত অংশের জন্য রহিয়াছে অবাধ দুর্নীতির ব্যবস্থাপনা। কনিষ্ঠ-মধ্যম-জ্যেষ্ঠ বর্গীয় নেতৃবর্গের আঙুল ফুলিয়া কলা গাছ হইবার রোমহর্ষক কাহিনী। তালিকায় রহিয়াছে স্বীয় এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর ভাতা কতিপয়গুণ বৃদ্ধি করিবার 'সৎ' প্রয়াস। আর 'অনেক দিয়েছি'-র এই তালিকাটিকে আকর্ষণীয় ও বিক্রয়যোগ্য করিবার জন্য নীল-সাদা রঙের আকর্ষণীয় মোড়কে হাজির করা হইয়াছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও রাজ্য সরকারী কর্মীগণ মহার্ঘভাতা লইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিবার স্পর্ধা দেখাইবে? 'দিয়েছি'-র উল্লিখিত দীর্ঘ তালিকার সহিত, মাত্র ২৮ শতাংশ মহার্ঘভাতা কখনও তুলনীয় হইতে পারে? কখনোই নহে। অতএব অনেক দিয়েছির তালিকা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে—এমনই নিদান হাঁকিয়েছেন তিনি। এই নিদান মানিব কি মানিব না, তা নির্ধারণ করিবার অধিকার দেশের সংবিধান আমাদের প্রদান করিয়াছে। অতএব... □

৪ চৈত্র, ১৪২৮

প্রসঙ্গ ঃ কেন্দ্রীয় বাজেট (২০২২-২৩)

অসম রাজকোষ নীতির প্রতিমূর্তি ও অজ্ঞতার প্রাচুর্য

জয়তী ঘোষ
(বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ)

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রক, আরও একবার ভারতীয় অর্থনীতি এবং যে পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ভারতবাসী জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন, সে সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতার স্বাক্ষর রাখলেন। ঘুরে দাঁড়ানো সম্পর্কিত বাগাড়ম্বরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, অর্থনীতি এখনও দুর্বল এবং অধিকাংশ মানুষ সঙ্কটে রয়েছেন।

সাম্প্রতিককালে দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির নিরিখে সারা বিশ্বে ভারতের অবস্থান একেবারে প্রথম দিকে। কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান, বিশেষত দেশে জনবিন্যাসের অনুকূল বাস্তবতা সত্ত্বেও, শোচনীয়। বৃহৎ কর্পোরেটদের বারংবার বিপুল প্রণোদনা ও ছাড় দেওয়ার পরেও বেসরকারী বিনিয়োগের চিত্র হতাশাজনক। অতিমারির সময়ে কৃপণ ও অপর্যাপ্ত সরকারী ব্যয়, ভারতকে মধ্য আয়ের দেশগুলির মধ্যেও পিছনের সারিতে রেখে দিয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্য সঙ্কট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর্বেও অধিকাংশ ভারতীয় তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার এবং জরুরি সরকারী পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অতিমারির ধাক্কা লাগার আগেই, গণভোগ ব্যয় হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনীতিতে চাহিদার সঙ্কট তৈরি হয়েছিল। এর মধ্য দিয়েই কর্মসংস্থান এবং জীবিকা নির্বাহের মৌলিক চিত্র প্রতিফলিত হয় ঃ ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প যেখানে ভারতের শ্রমশক্তির সিংহভাগ যুক্ত, তা ভেঙে পড়ছে; কৃষি ক্ষেত্রের সাথে যারা যুক্ত তাদের যন্ত্রণার উপসম হয়নি; প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত কোটি কোটি যুবক-যুবতী, যারা উন্নত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করে, তাদের জন্য জন্য কর্মসংস্থানের কোনো নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়নি বললেই চলে। এই সময়কালেই জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষার হাল আরও শোচনীয় হয়ে এক অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।

যদি অর্থমন্ত্রকের এই বিষয়গুলি সম্পর্কে উদ্বেগ থাকত, তাহলে আমরা একেবারে অন্যরকমের বাজেট দেখতে পেতাম—এমন একটি বাজে যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগকে বাঁচানোর দিকে নজর দিত, কৃষকদের সমস্যাকে বিবেচনায় রাখত, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটানো হতো এবং শহরাঞ্চলের জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প শুরু করা হত, অতিমারিজনিত সামাজিক সঙ্কট থেকে বেড়িয়ে আসা এবং বহু বছর ধরে ফেলে রাখা সমস্যার সমাধানের জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে

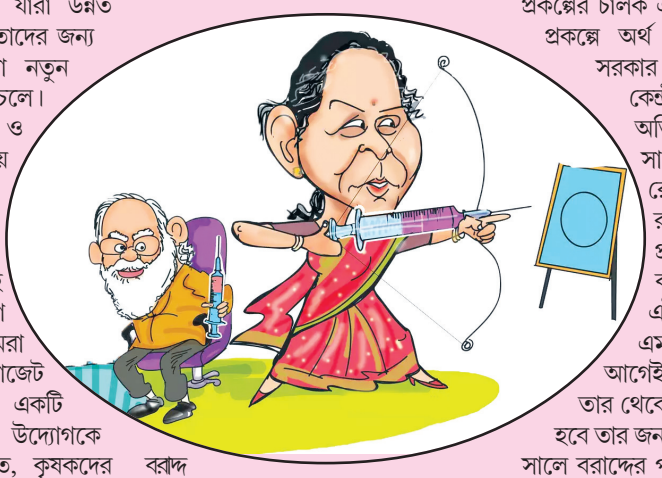

বরাদ্দ বিপুল বৃদ্ধি করা হত। কিন্তু এর কোনো কিছুই আমরা পাইনি। যে সমস্ত ক্ষেত্রগুলি মানুষের জীবনধারণ এবং জীবিকার জন্য এবং বৃহত্তর অর্থে গণচাহিদা সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলিতে বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম রাখা হয়েছে। এমনকি কোনো কোনো সঙ্কটপূর্ণ ক্ষেত্রে বরাদ্দ অতীতের তুলনায় কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রবণতায় সব থেকে বড় এবং ভয়াবহ ইঙ্গিত হল, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাস করা। আইনানুগভাবেই চাহিদাই হল এই প্রকল্পের চালক এবং চাহিদা অনুযায়ী এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকার আইনত বাধ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার, এমনকি অতিমারির সময়েও, যখন সাধারণ মানুষের রোজগারের অন্য সমস্ত রাস্তা বন্ধ, তখনও এই প্রকল্পে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ করেনি। প্রত্যেক বছরেই এই প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থ, এমনকি রাজ্যগুলি তার আগেই যে খরচ করে ফেলেছে, তার থেকেও কম এবং যা প্রয়োজন হবে তার জন্য পর্যাপ্ত নয়। ২০২০-২১ সালে বরাদ্দের পরিমাণ, লকডাউনজনিত গভীর সঙ্কটের ধাক্কা সামলাতে কিছুটা বৃদ্ধি করতেই হতো। কিন্তু এই বর্ধিত বরাদ্দও ছিল প্রয়োজনের তুলনায় কম।

অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় হল, বর্তমান আর্থিক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার এম জি এন আর ই জি এ প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৭৩,০০০ কোটি টাকায় নামিয়ে এনেছে অথচ, এটা স্পষ্টত জানাই ছিল যে রাজ্যগুলির মজুরি মেটাতে মোট খরচ হবে প্রায় ১,২০,০০০ কোটি টাকা। ডিসেম্বরে কিছু অতিরিক্ত বরাদ্দ করার ফলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮,০০০ কোটি টাকা। যদিও তা দিয়েও সমস্ত রাজ্য ইতোমধ্যেই যে খরচ করে ফেলেছে তা মেটানো যাবে না এবং বর্তমান আর্থিক বছরে আরও দু'মাস এই প্রকল্পের কাজ হবে। তা সত্ত্বেও আগামী আর্থিক বছরের জন্য বরাদ্দ পুনরায় ৭৩,০০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। যেহেতু এর থেকে ২০,০০০ কোটি টাকা আগের বছরের বকেয়া পরিশোধ করতে খরচ হবে, তাই অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে বর্তমান মজুরির হার অনুযায়ী পরিবার পিছু বছরে ২০ দিনেরও কম কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। এর প্রভাব শুধুমাত্র প্রকল্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না : কারণ এই প্রকল্প গণচাহিদা বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে এবং স্থানীয় ক্ষুদ্র উদ্যোগের পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হয়।

একইভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, বর্তমান সময়ে যার গুরুত্ব চরম

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলামে

সফদর আজও বেঁচে

দেবাশীষ রায়

সফদর হাসমি একজন বামপন্থী নাট্যকার এবং পরিচালক ছিলেন, যিনি ভারতে স্ট্রীট থিয়েটার নিয়ে তার কাজের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তিনি একজন অভিনেতা, গীতিকার এবং তাত্ত্বিকও ছিলেন এবং তাকে এখনও ভারতীয় রাজনৈতিক থিয়েটার-এ এক গুরুত্বপূর্ণ কণ্ঠ হিসাবে স্মরণ করা হয়। "সফদার হাসমি, দ্য এনচান্টেড আর্চ, অর দি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড কালেকটিভ ভিউজ অফ আর্ট" (এপ্রিল ১৯৮৩), দ্য রাইট টু পারফর্ম (পৃষ্ঠা ২৮-২৯)-এ বলা হয়েছে কোনো বিষয়ের ওপর উপস্থাপিত নাটকটি কোথায় পরিবেশিত হয় তা নয় (রাস্তার থিয়েটার শুধুমাত্র একটি উপায় যা শিল্পের মূল বিষয়টি মানুষের কাছে উপলব্ধ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য), তবে প্রধান সমস্যাটি হল 'শিল্পের বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জনগণের সমষ্টিবাদীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট এবং অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব, শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী।

হাসমি দুটি প্রসেনিয়াম ও নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন—ম্যাক্সিম গোর্কির 'শত্রুর'-একটি রূপান্তর (১৯৮৩) এবং মোতেরাম কা সত্যাগ্রহ (হাবিব তানভীরের সাথে, ১৯৮৮) যা অন্যদের থেকে তার ভাবনার স্বকীয়তার নিদর্শন স্বরূপ। অনেক গান, একটি টেলিভিশন সিরিজের স্ক্রিপ্ট, শিশুদের জন্য কবিতা এবং নাটক ও তথ্যচিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন। সমকালীন সময়ে জনপ্রিয় এবং বামপন্থী শিল্পের প্রতি আজীবন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা সফদর ক্লিচেড চিত্রায়ন থেকে বিরত ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ভারতীয় নাট্যজগৎ তথা পথনাটিকাকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে ছিলেন এবং এক্ষেত্রে কোনো চাপেই তিনি নত হননি।

সফদর হাসমি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আনিফ হাসমি এবং মাতা কমর আজাদ হাসমি। তিনি তার জীবনের প্রথম দিকে দিল্লী এবং আলিগড়ে কাটিয়ে ছিলেন। সেখানে তিনি একটি উদার বামপন্থী পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। দিল্লীতে সেন্ট স্টিফেন কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে ডিগ্রি নিতে স্নাতক হন এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ সম্পন্ন করেন। এই সময়কালে তিনি ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের (SFI) সাংস্কৃতিক ইউনিট, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) এর ছাত্র শাখা এবং পরবর্তীতে ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আই পি টি এ)-এর সাথে যুক্ত হন।

১৯৭৩ সালে হাসমি জননাট্য মঞ্চ (পিপলস থিয়েটার ফ্রন্ট) সংক্ষেপে জনম, (হিন্দিতে 'জন্ম') প্রতিষ্ঠা করেন সেটি ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন (আই পি টি এ) থেকে বেড়ে ওঠে। যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ আনা হয়, তখন তিনি বিতর্কের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পথনাটক 'কুরসি, কুরসি, কুরসি' (চেয়ার, চেয়ার, চেয়ার) নির্মাণ করেন। নাটকটি এমন এক রাজার গল্প বর্ণনা করে যার সিংহাসন নড়বড়ে। সেই রাজা পরবর্তীতে তার সিংহাসন নির্বাচিত প্রতিনিধির পক্ষে ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। নাটকটি এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন মঞ্চস্থ হয়েছিল নতুন দিল্লীর 'বোট ক্লাব লনে'—যা তখন ছিল রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল। এই পথ নাটকটি জনম-এর একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত জনম দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত—এয়ার প্রসেনিয়াম এবং রাস্তার নাটক পরিবেশন করেছিল। যখন ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং রাজনৈতিক থিয়েটারকে বন্ধ করতে প্রশাসনকে ব্যবহার করেন তখন হাসমি গাড়ওয়াল, কাশ্মীর এবং দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী সাহিত্যের লেকচারার হিসাবে কাজ শুরু করেন।

১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসান হলে তিনি রাজনৈতিক সক্রিয়তায় ফিরে আসেন এবং ১৯৭৮ সালে উন্নত প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে জনম বড় আকারে রাস্তার থিয়েটারে নেমেছিল এবং ২০ নভেম্বর ১৯৭৮-এ দু লক্ষ কর্মী শ্রমিকদের একটি ট্রেড ইউনিয়ন মিটিং-এর জন্য সঞ্চালিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় যেমন ছোটো কৃষকদের দুর্দশা (গাঁও সে শহর তক), যাজক ফ্যাসিবাদ (হাওয়ারে এবং আফরান ভাইচারে কে), বেকারত্ব (কিশোর কোটি) নারীর প্রতি সহিংসতা (আওরাত) এবং মুদ্রাস্ফীতি (ডি টি সি কি ধান্ধলি) নিয়ে নাটকগুলি সফদর মঞ্চস্থ করেছিলেন। তিনি দূরদর্শনের জন্য বেশ কিছু তথ্যচিত্র এবং একটি টিভি সিরিয়ালও তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে রয়েছে খিলতি কালিয়ান (ফ্লাওয়ারস ইন ব্লুম), যার মধ্য দিয়ে গ্রামীন জীবনকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। তিনি শিশুদের জন্য বই এবং ভারতীয় মঞ্চ বিষয়ে সমালোচনা মূলক প্রবন্ধও লিখেছেন।

১৯৭৯ সালে তিনি তার সহযোদ্ধা এবং থিয়েটার অভিনেত্রী মলয়শ্রীকে বিবাহ করেন। তার স্ত্রীও তাঁর মতোই বামপন্থী আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন। পরবর্তীতে সফদর প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া (পিটিআই) এবং দ্য ইকনমিক টাইমস-এর সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন এবং তারপর তার সক্রিয়তার কারণে দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রেস ইনফরমেশন অফিসার হন।

১৯৮৯ সালে সমকালীন পরিস্থিতি নিয়ে রচিত জনপ্রিয় পথনাটক 'হল্লা বোল'-মঞ্চস্থ করার সময় প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর সমাজ বিরোধীদের হাতে সফদর হাসমি খুন হন। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা, সফদরদের হত্যা করে প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার চেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না।

হাসমি 'জনম'-এর ডি-ফ্যাক্টো ডিরেক্টর হিসাবে তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় ৪০০০টি স্থানে ২৪টি পথনাটক পরিবেশন করেছিলেন যার বেশির ভাগই শ্রমিক-শ্রেণির পাড়া, কারখানা এবং কর্মশালায়। সফদর মানে প্রতিবাদ, সফদার মানে বেঁচে থাকা, সফদর মানে জাগিয়ে রাখা—এই সফদরকে খুন হতে হয়। সফদরদেরকে শাসক শ্রেণী ভয় পায়, কারণ এক সফদর লক্ষ মানুষের ভারতবর্ষে যতদিন পথনাটক থাকবে, যতদিন নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বরকে নাটক-এর মাধ্যমে পরিবেশন করার প্রচেষ্টা নেওয়া হবে, ততদিন সফদর প্রাসঙ্গিক থাকবেন। **"সফদর জেগে আছে / অকাল বসন্তে কোলাহল / কারা যেন মহড়া দেয় / কারা যেন কবিতা লেখে / সফদর জেগে আছে স্পর্ধার ইঞ্চি মাপে / সফদর জেগে আছে কলমে আর সংগ্রামে।"** □

প্যারি কমিউনের আদর্শ অবিনশ্বর

প্রবীর মুখার্জী

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার দাবিতে ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে ফরাসী বিপ্লব গোটা বিশ্বে আলোরণের সৃষ্টি করে। সমাজ বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো থেকে পুঁজিবাদী কাঠামোতে রূপান্তরিত হওয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ছিল এই ফরাসী বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লবের তিন বছর পরে ১৭৯২ সালে ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষিত হয়। কিন্তু দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলতেই থাকে। ১৮৫১ সালে দেশের প্রেসিডেন্ট লুই বোনাপার্ট এফ ক্যুদেতার মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। ১৮৫২ সালে নতুন সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের অবসান হয় এবং প্রেসিডেন্ট লুই বোনাপার্ট তৃতীয় বোনাপার্ট হিসাবে ফ্রান্সের সম্রাট ঘোষিত হন। তিনিই ইতিহাসে তৃতীয় নেপোলিয়ান হিসাবে খ্যাত। এই পূর্ব ইতিহাস না জানলে ঐতিহাসিক প্যারী কমিউনের ঘটনাবলী অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক অস্থিরতার এই সময়কালে পুঁজিবাদের প্রসারের জন্য ফ্রান্সে কৃষকশ্রেণীর পাশাপাশি শিল্পে শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। এই শ্রমিকরা শাসকশ্রেণীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সংঘাতে লিপ্ত হয়। ১৮৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন বিদ্রোহ ও ধর্মঘট শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনা তৈরিতে সাহায্য করে।

এর মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে কমিউনিস্ট লীগ। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে কমিউনিস্ট ইস্তাহার। যার অন্যতম স্লোগান "দুনিয়ার মজদুর এক হও"। ১৮৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস সহ বিভিন্ন সাম্যবাদী নেতারা ফ্রান্সের ঘটনাবলীর উপর নজর রাখতে থাকেন। প্যারি কমিউনের প্রসঙ্গে মার্কসের বহু লেখা সেই সময়ে বা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়।

১৮৬৬ সালে ইউরোপে অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়ার যুদ্ধে প্রুশিয়া জয়ী হবার পর প্রুশিয়ার নেতৃত্বে অনেকগুলি ছোটো ছোটো জার্মান রাজ্য একত্রিত হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৭০ সালে সেদান নামে এক জায়গায় প্রুশিয়া ও ফরাসী বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান পরাস্ত হন এবং বন্দী হন। ৮০ হাজার ফরাসী সৈনিক ও অফিসাররা আত্মসমর্পণ করেন।

১৮৭০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তাসের ঘরের মতো ফরাসী সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং ফ্রান্সে আবার প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী বুর্জোয়াদের নেতা তিয়েরের নেতৃত্বে জাতীয় প্রতিরক্ষা সরকার তৈরি হয়।

দেশে প্রজাতন্ত্র এল, কিন্তু শত্রু দুয়ারে দাঁড়িয়ে। তারা রাজধানী প্যারিস দখল করতে চাইছে। এদিকে দেশের সেনাবাহিনী হয় অবরুদ্ধ নয় বন্দী। এই অবস্থায় প্যারিসের নাগরিকরা নিজেরাই বন্দুক কাঁধে নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে উঠলেন—যাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল শ্রমিক। দলে দলে মানুষ জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগ দিল। ১৮৭০ সালের ৩১ অক্টোবর বুর্জোয়া জাতীয় সরকার সশস্ত্র শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। সরকারের

একাংশকে বন্দী করা হয়। কিন্তু গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে বুর্জোয়া সরকারকেই ক্ষমতায় রাখা হয়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী ও নাগরিকদের বিভিন্ন গণআন্দোলনে ভয় পেয়ে ১৮৭১ সালের ২৮ জানুয়ারি দেশবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রুশিয়া সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় প্রধানমন্ত্রী তিয়েরের নেতৃত্বে বুর্জোয়া জাতীয় সরকার। অবরোধের ফল খাদ্যের অভাবে ক্লিষ্ট প্যারিসের আমজনতা ও শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চায় হয় এই সিদ্ধান্তের ফলে। তারা অস্ত্র হাতছাড়া করল না। জয়ী সেনাবাহিনীও শহরে প্রবেশ করার সাহস দেখাল না। সারা শহর জুড়ে জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বিশাল গণবিক্ষোভের আকার নেয়। এই বিক্ষোভে শ্রমিকশ্রেণী সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেয় এবং জাতীয় সরকারের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে নেমে পড়ে। মার্কস সেই সময়ে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণীকে এই বলে সতর্ক করেছিলেন যে সঠিক সময় এখনও আসেনি। যদিও প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে জাতীয় সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সরাসরি সংঘর্ষের পর তারা প্যারিস ছেড়ে ভার্সাইতে পালিয়ে যায়। বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রমিকরা লাল পতাকা উড়িয়ে বিজয় ঘোষণা করে। ১৮৭১ সালের ২৮ মার্চ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বে জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয় এবং প্রজাতন্ত্রের সৈনিকদের জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করতে বলা হয়। গঠিত হয় প্যারিস কমিউন। এই কমিউনের কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেন প্যারিসের বিভিন্ন প্রশাসনিক জেলাগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যারা সবাই শ্রমিকশ্রেণীর অংশ ছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় কমিউনের শ্রেণীচরিত্র ছিল সর্বহারার।

কার্ল মার্কস "থিসিস অন ফয়েরবার্খ" প্রবন্ধে বলেন যে "দার্শনিকরা এতকাল পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হল পৃথিবীকে পরিবর্তন করা।" এই বিখ্যাত মন্তব্য সমাজ পরিবর্তনের লড়াইতে প্রধান দর্শনে পরিণত হয়েছে। এই দর্শনের তত্ত্ব ও অনুশীলনের মেলবন্ধনের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রয়োগের যে প্রথম প্রচেষ্টা আমরা দেখেছি তা হল প্যারি কমিউন। প্যারি কমিউন হল শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বে পরিচালিত পৃথিবীতে প্রথম রাষ্ট্রব্যবস্থা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে টানা ৭২ দিন এই কমিউন প্যারিস পরিচালনা করে যা আজও এক দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। মার্কসের তত্ত্ব যে কল্পরাজ্যের কথা না তা প্রথমবার প্রমাণ করেছিল প্যারিস কমিউন।

কমিউনের নেতৃত্বে বন্ধ কারখানাগুলি আবার চালু করা হয়। এগুলি পরিচালনা করে শ্রমিকদের কমিটি। কমিউন হয়ে উঠছিল প্যারিসের সর্বহারা মানুষের মুক্তির আশ্রয়। শ্রমিকদের অবমাননাকারী বিভিন্ন আইন বাতিল করা হয়। যুদ্ধে নিহতদের পরিবারের দায়িত্ব নেয় কমিউন। শোষিত মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়। সমস্ত রাজনৈতিক কর্মীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ধনীদের সমস্ত বাড়ির ভাড়া কমানো হয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সবার জন্য খুলে দেওয়া হয়। শিল্পকলার বিভিন্ন মিউজিয়াম সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের কাজের সময় কমিয়ে ৮ ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হয় এবং রাত্রিকালীন কাজ বন্ধ করা হয়। বেতন

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

'বৃত্ত বাড়াও', 'বন্ধু বাড়াও', 'চেতনা বাড়াও'

সুতপা হাজরা

৭৫ বছরের স্বাধীনতা আমাদের, ৭২ বছরের সাধারণতন্ত্র। মহা ধুমধামে পালিত হয়েছে ৭৩তম সাধারণতন্ত্র দিবস। কয়েক মাস পরে এর চেয়েও বহুগুণ আড়ম্বরে পালিত হবে দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। একটা দেশের কাছে যা নিঃসন্দেহে গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। যার উদ্‌যাপন যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে হবে সেটাই স্বাভাবিক। বলতে দ্বিধা নেই এই সাধারণতন্ত্রকে সার্বিকভাবে গ্রাস করেছে ধনীতন্ত্র। সাধারণ মানুষকে রিক্ত, নিঃস্ব করে ধনীদের ঘরে সম্পদের পাহাড় জমা হচ্ছে দিনের পর দিন। এই বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানকে অমৃত মহোৎসবের নামে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রামের পুরো ধারণাটিকেই লঘু করতে এবং আধ্যাত্মিক সামাজিক প্রবণতাগুলিকেও স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে উপস্থিত করার অভিযান চলছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের কোনো ভূমিকা ছিল না, বরং যারা বিশ্বাসঘাতকতা করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে তাদেরকেই মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। এসব প্রচেষ্টা আসলে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের মূল ভিত্তিটাকে চ্যালেঞ্জ জানাবার লক্ষ্যে পরিচালিত। আসলে সাধারণতন্ত্রের সাংবিধানিক ভিত্তির বৈধতা নস্যাৎ করতে না পারলে হিন্দু রাষ্ট্রকে বৈধতা দেওয়া যায় না।

এদিকে অতিমারি বিধ্বস্ত শ্রম বাজারে ভারতের শ্রম চিত্র অত্যন্ত করুণ। সম্প্রতি আই এল ও তাদের ওয়ার্ল্ড এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সোশ্যাল আউটলুক-ট্রেন্ড রিপোর্ট (২০২২)-এ উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছে ভারত সহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশে সরকার শ্রমিকদের জীবন-জীবিকার সঙ্কট মেটাতে উপযুক্ত পরিকল্পনা না নেওয়াতেই দু'বছরেও এই বেহাল দশা কাটছে না। শ্রম বাজারে শ্রমিকের কাজ এবং তার আয়ের কোনো উন্নতি না হলে বিধ্বস্ত অর্থনীতির কোনোভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাই দেখছে না আই এল ও। আই এল ও পূর্বাভাসে জানাচ্ছে অতিমারির সময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কোনো অগ্রগতি না ঘটায় চলতি বছর ২০২২-এ ভারতে বেকারির হার বেড়ে দাঁড়াবে ৫.৪ শতাংশ যা প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের থেকেও বেশি। আবার আর্থিক সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে অতিমারির বছরে ৮৪ শতাংশ পরিবারের আয় কমেছে। বেতনভুক কর্মীদের অর্ধেকই কাজ হারিয়েছে। অথচ এই সময়ে ৪০ জন নতুন শতকোটি ডলারপতির আবির্ভাব হয়েছে এবং এই ডলারপতিদের সম্পদ করোনাকালের আর্থিক বিপর্যয়ের সময় ২৩.১৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে আড়াই গুণ বেড়ে ৫৩.১৬ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য নির্লজ্জতার শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৫ বছর পর নানা সমীক্ষা দেখিয়ে দিচ্ছে মেয়েদের অবস্থা এবং অবস্থান ক্রমশ টলমল, বিশেষত গত দু'বছরে। যদি আর্থিক সমীক্ষার দিকে তাকাই দেখব সংগঠিত কর্মস্থলে মেয়েদের যোগদানের হার আগের চেয়ে কমেছে। কোভিড লকডাউনের সময় এমনিতেই সঙ্কুচিত কর্মক্ষেত্র থেকে দ্রুত ছাঁটাই হয়ে বাড়িতে ফিরে যেতে হয়েছে মেয়েদের, নিতে হয়েছে সম্পূর্ণ সময়ের বয়স্ক ও শিশুদের সেবার দায়, রান্নাবান্না ও অন্যান্য সাংসারিক কাজের দায়। 'গৃহকর্মে নিপুণা'-র পুরোনো রোল মডেলেই ফিরতে হয়েছে তাদের। অপরিকল্পিত লকডাউনের ধাক্কায় বহু ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যেরও কাজ চলে গেছে। ফলে সংসারে নেমে এসেছে বিপর্যয়। এই ধরনের কর্মক্ষেত্রে বিপর্যয় বা মাইনেতে ছাঁটকাটের পর বিক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত, মানসিকভাবে পর্যুদস্ত পুরুষের মেজাজের দায়, অনিশ্চয়তা ও হতাশাজনিত ক্ষোভ ও রাগের যে বহিঃপ্রকাশ, তার শিকার তো তাদের স্ত্রীরাই। তাই ২০২১ সালের জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেশের এক বড় অংশের মেয়েরা জানালেন—স্বামীর দ্বারা প্রহৃত হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। আপত্তিরও নয়। মার খাওয়ার সাত রকমের কারণের মধ্যে যেমন রয়েছে পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তেমনি রয়েছে খারাপ রান্না করা। এ তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে তেলেঙ্গানা। সে রাজ্যের ৮৩.৮ শতাংশ মহিলা বউ পেটানোর পক্ষে। পুরুষদের মধ্যে সবার আগে কর্ণাটক। সে রাজ্যের ৮১.৯ শতাংশ পুরুষ মনে করে বউ পেটানো দোষের নয়। হিমাচলে আবার পুরুষ-নারী নির্বিশেষেই এসব বিশ্বাস করে খুব কম শতাংশ মানুষ। আর পশ্চিমবঙ্গ? ৪২ শতাংশ মেয়ে পিটুনি খেতে রাজি। ১৯৮৩ সালে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে যুক্ত হয়েছিল ৪৯৮-এ ধারা—শ্বশুরবাড়িতে বিবাহিত মহিলাদের সুরক্ষা দিতে। ২০০৫ সালে পাশ হল গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইন—পরিবারের পুরুষ সদস্যদের হাত থেকে নারীকে সুরক্ষা দিতে। তাহলে কি আইনী সুরক্ষাকবচ রাষ্ট্রের ছাপ্পা পেলেও দেশের মেয়েদের মনের দুয়ারে পৌঁছোতে পারেনি? পাশাপাশি নানা সামাজিক ও গণ আন্দোলনের পরও দু'ডানায় ভর দিয়ে ওড়ার স্বপ্নটা কি উপেক্ষিতই থেকে যাবে? হয়তোবা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মেয়েদের জীবন এই বাস্তবের চেয়েও আরও করুণ, আরও ভয়ঙ্কর। অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেই কেটে যায় মার খাওয়া এই জীবন। নিজের জীবনকে বৈধতা দিতে, সুখী বলতে চেয়ে তখন মেয়েরা ভাবে—পারিবারিক নিপীড়ন স্বাভাবিক বিষয়। সত্যি ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া!

এদিকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সেই কুখ্যাত ডায়ালগ "আপ ক্রোনোলজি সমঝ লিজিয়ে" ক্রমশঃ সামনে আসছে, তা শুধু নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ নয়। পরিসর আরও বড়, তাৎপর্য আরও ব্যাপক, সম্প্রতি উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুর নেতৃত্বে যে ধর্ম সংসদের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে স্পষ্ট ভাষায় মুসলিম গণহত্যার ডাক দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টভাবেই অসমের ইঞ্জিনীয়ারিং পাঠরত তরুণ নীরজ বিষ্ণোই জানিয়েছে যে 'বুল্লি বাই" অ্যাপটি নির্মাণ এবং ব্যবহার নিয়ে তার কোনো অনুশোচনা নেই। এই অ্যাপ ব্যবহার করে মূলত মুসলিম মহিলাদের, যারা বিভিন্ন সময় মোদি সরকারের সমালোচনা করেছে, তাদের 'নিলামে' তোলা হয়েছে। আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। অনুমতির তোয়াক্কা না করে তাদের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। বছর খানেক আগে প্রায় একই কায়দায় মুসলিম মহিলাদের ছবি ব্যবহার করে নিলামের জন্য তালিকাভুক্ত করার অভিযোগ ওঠে 'সুল্লি ডিল' অ্যাপের বিরুদ্ধে। সরকারের তরফে তখন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আসলে ভারত খাতায় কলমে এখনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলেও কার্যক্ষেত্রে তা হিন্দুরাষ্ট্রের ভূমিকাই পালন করছে।

সরকারী স্লোগানে 'বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও'-এর দেশ কি তার বেটিদের সেই সুযোগ দিচ্ছে? দেশটা আফগানিস্তান হোক অথবা আমার

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ সাধারণ ধর্মঘট

কর্পোরেট দালালদের সমুচিত জবাব দেবে

বিজয় শঙ্কর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি)

এই সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্যে ভয়ঙ্কর কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি ও সারা বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের অসহায় দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, উদারবাদী অর্থনীতির দেউলিয়াপনা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোভিড অতিমারিতে জীবনহানির পাশাপাশি বিশ্ব অর্থনীতির উপর ব্যাপকভাবে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি সব থেকে বেশি আক্রান্ত হয়েছে। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমেছে। স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন কমেছে এবং কোটি কোটি চাকুরিজীবি কাজ হারিয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতি সবচেয়ে গভীর মন্দার আর্বতে পড়েছে। প্রায় ১৫ কোটি মানুষ কাজ হারিয়ে গভীর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছে। এই সঙ্কটের মধ্যেও চীন জি ডি পি শতকরা ৩.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করেছে। আমাদের দেশে জি ডি পি শতকরা ২৩.৯ শতাংশ কমেছে। এছাড়া বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও জি ডি পি শতকরা ৫.৯ শতাংশ কমেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলি এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে স্ব স্ব দেশের মানুষকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে অথচ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের দেশের মানুষকে রক্ষা করতে অনেকাংশে সফল হয়েছে। তারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে রেখেছে বলেই এ কাজ সম্ভব হয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছে। কোভিড অতিমারি মোকাবিলায় নয়া উদারনীতি ব্যর্থ, নয়া উদারনীতির একটাই লক্ষ্য মুনাফা, তাই গরীব ও ধনীর মধ্যে বিশাল বৈষম্য তৈরি হয়েছে। কোভিড মহামারি পরিস্থিতিতে শত কোটি ডলারপতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা সর্বোচ্চ মুনাফার লোভে জনগণের উপর নির্মমভাবে দুর্দশার বোঝা চাপিয়েছে। এর মধ্যেও আশার দিক, নব্য উদারনীতির আক্রমণের প্রতিবাদে বিশ্বের দেশে দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। এমনকি একাধিক ধর্মঘট হয়েছে। লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে বামপন্থার প্রত্যাবর্তন ঘটছে। বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ বামপন্থাকেই হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছে। অতি সম্প্রতি হুন্ডুরাস, পেরু, চিলিতে রাষ্ট্রপতি ভোটে জিতেছেন বামপন্থীরা। এছাড়া মেক্সিকো ও ব্রাজিলে রাষ্ট্রপতি ভোটে জেতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বামপন্থীদের।

বিগত নব্বই-এর দশক থেকে আমাদের দেশে নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়ায় একাধিক পর্বে সাধারণ মানুষের জীবনে রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক ভূমিকাকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। যদিও ইউপিএ-১ সরকারের সময়ে বামপন্থীরা সেই সরকারের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রেগা, অরণ্যের অধিকার ও খাদ্য সুরক্ষাসহ শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে একাধিক জনমুখী আইন প্রণীত হয়। বর্তমানেও এই সমস্ত প্রকল্প ও আইনের সুযোগ মানুষ পাচ্ছে। আর. এস. এস.-বি জে পি সরকার ২০১৪ সালের পর থেকে কর্পোরেট লগ্নীপুঁজির স্বার্থে তাদের কাজ করে চলেছে। স্বাধীনতার পর থেকে তিল তিল করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলি একের পর এক জলের দরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। যা স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনীতির ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিল। দেশের সম্পদকে নির্বিচারে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে "National Monetization Pipe Line" নামে কর্মসূচী নিয়েছে। দেশের মানুষের সম্পদকে লুটের ব্যবস্থা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। পেট্রোপণ্যের দর ব্যাপকহারে বৃদ্ধি ঘটেছে। পেট্রোল ডিজেলের দর সেঞ্চুরি পার করেছে, গ্যাসের দাম প্রায় হাজার টাকা, ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া হয়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে শ্রমিক কর্মচারীসহ শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকার ওপর। কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে দেশের অর্থনীতিকে বাজারমুখী করার ফলে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ছে। শ্রমিকের মজুরি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে, শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, কাজ হারাচ্ছে মানুষ, কোভিড মহামারিতে আরো ভয়াবহ অবস্থা হয়েছে যা সারা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করেছে। দেশে শ্রমিক কর্মচারীদের কাজ ও মজুরির নিরাপত্তা নেই, সর্বোপরি সামাজিক নিরাপত্তা থাকছে না। শ্রমিক কর্মচারীদের এক অসহনীয় কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ফেলা হচ্ছে। শ্রমিকের স্বার্থে যে আইন লাগু হয়েছিল, তা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে শ্রম কোড এনে। লড়াই করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এক কথায় শ্রমিক কর্মচারীদের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চাইছে। সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের প্রসার ঘটে চলেছে। শ্রমিক কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত আদায়যোগ্য দাবি অস্বীকার করা হচ্ছে বা দর কষাকষির অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আর এস এস-বিজেপি শ্রমজীবি মানুষের ঐক্যকে ভাঙার লক্ষ্যে বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক বিভাজনের কলুষিত রাজনীতি করে চলেছে।

এছাড়া এই সময়কালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির প্রশাসনিক কাঠামোগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। লক্ষ লক্ষ স্থায়ী শূন্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না। স্থায়ী পদের ধাপে ধাপে বিলোপ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির প্রশাসনের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ক্যাডারে চুক্তিপ্রথায় ও এজেন্সি প্রথায় নিয়োগ হচ্ছে। পাঁচ, দশ, পনেরো হাজার টাকায় নিয়োগ হচ্ছে, তাদের নেই কোনো চাকরির ও সামাজিক নিরাপত্তা।

চরম শোষণ চলছে। কর্মসংস্থাহীন কর্পোরেটমুখী বাজেট পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক খাতে বরাদ্দ কমেছে। কৃষকের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এই বাজেটে। অথচ ফকির প্রধানমন্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জনগণের করের অংশ দিয়ে ৮৫০০ কোটি টাকা দিয়ে বিশেষ বিমাও কেনা হয়েছিল আগেই। প্রায় ১৩,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে বাসভবন তৈরি করা হচ্ছে। এখন ১২ কোটি টাকা দিয়ে দুখানি গাড়ি কেনা হয়েছে। নির্মম নজিরবিহীন ঘটনা।

১৯৯০-এর দশকে নয়া উদারনীতি চালু হওয়ার পর থেকে অর্থনীতিতে পরিষেবা ক্ষেত্রের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিষেবার এই প্রসারের ফলে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যাদের সাথে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক ইত্যাদি ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তের ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পার্থক্য রয়েছে। নব্য মধ্যবিত্ত বিশ্বায়নের সৃষ্টি (যেমন আই.টি সেক্টরে)। কিন্তু ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্ত বিশ্বায়নের সৃষ্টি না হলেও, বিশ্বায়নের প্রভাব মুক্ত নয়। ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তের একটা সাধারণ ঝোঁক ছিল অবসর সময় ট্রেড ইউনিয়ন, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত থাকা। এই কর্মকাণ্ডের একটা ক্ষেত্র ছিল যৌথ আলোচনা, তর্ক বিতর্ক। যা মধ্যবিত্তের এই অংশকে আরও বেশি সমাজমুখীন করে তুলত। এর বাইরে ছিল বই পড়ার অভ্যাস। গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত থাকা। কিন্তু বিশ্বায়নের দাপটে এই অভ্যাসগুলির অনেকটাই আজ পরিত্যক্ত। অবসর সময় মূল পেশার বাইরে অন্য কোনো ধরনের সূত্র থেকে (যেমন টিউশন, টুকিটাকি ব্যবসা) আয় বৃদ্ধি করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। সন্তানের কেরিয়ার গড়াকে পাখির চোখ করে দিনের একটা বড় অংশ ব্যয় করাও নতুন প্রবণতা। এর ফলে ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তের একটা প্রজন্ম যেমন নিজের চিরাচরিত অ্যাক্টিভিটি থেকে সরে আসছে, তেমনই সন্তান-সন্ততি অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্মের সমাজ বিমুখ, কেরিয়ার সর্বস্ব মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে চলেছে। বই পড়ার অভ্যাসও এখন আর বিনোদনের মাধ্যম নয় ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্তর কাছে। পরিবর্তে বৈদ্যুতিক গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকা এখন অবসর সময় কাটানোর শ্রেষ্ঠ উপায়। যৌথ আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, বিভিন্ন সমবেত কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া এবং বই পড়ার মধ্য দিয়ে যে চেতনার বিকাশ ও সমাজমনস্কতা গড়ে উঠত, আজ সেখানে বড় ধরনের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার চাপিয়ে দেওয়া মতকেই নিজের মত হিসেবে গ্রহণ করে তদনুযায়ী প্রতিক্রিয়া ঘটানোর প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক কথায় সমাজে 'ওপিনিয়ন মেকার'-এর ভূমিকা থেকে ট্র্যাডিশনাল মধ্যবিত্ত অনেকটাই সরে আসছে। চেতনায় শান দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি অনকেটাই রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, অবচেতনে ঝিমিয়ে থাকা পরিত্যক্ত কিছু ভাবনা (যেমন ধর্ম ও জাত-পাত ভিত্তিক পরিচিতি) কখনও কখনও মাথা চাড়া দিচ্ছে। এই পরিস্থিতি ভেদ করেই আমাদের মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াই সংগ্রাম জারি রাখতে হবে।

দেশজুড়ে শ্রমিক কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দিল্লীর বুকে লাগাতার ধরনা অবস্থানের কর্মসূচী জারি রেখে তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে কেন্দ্রের আর. এস. এস.-বিজেপির সরকারকে বাধ্য করেছে। এই ঐতিহাসিক আন্দোলন সাম্প্রদায়িক বহুমাত্রিক বিভেদের রাজনীতিকে মোকাবিলা করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। ধর্ম, জাত-পাতের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতিকে পরাস্ত করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সারা দেশের সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করেছে। শ্রমিক কর্মচারীরাও সামনের দিন জোড় লড়াই, জোট বাঁধো তৈরি হও এই মানসিকতা নিয়ে অবশ্যম্ভাবী লড়াইয়ের জন্য শপথ নিচ্ছে। আমাদের রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দশ বছরে সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে রাজ্যের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কুটির শিল্প, মাঝারি শিল্প প্রভৃতি সবক্ষেত্রে ধ্বংসের চেহারা। সমাজে সব স্তরে লুম্পেনরাজ চলছে। মানুষের দুর্দশা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। করোনা অতিমারিকালে এবং আমফান সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ বণ্টনকে কেন্দ্র করে এবং শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে একাধিক দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসছে। করোনা সংক্রমণকালে মানুষের স্বার্থে ও কর্মচারীদের পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে ধারাবাহিকভাবে কোভিড বিধি নিষেধ মেনেই কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়া বিগত দশ বছরে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা বিলুপ্তির পথে এগিয়েছে। বর্তমানে ২৮ শতাংশ মহার্ঘভাতার বকেয়া রয়েছে। মহার্ঘভাতার ঘোষণা করা হয় ভিক্ষার দানের মতো করে, যা কর্মচারী সমাজ ও তাদের পরিবারের প্রতি সামাজিক অসম্মান। ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট আমাদের দেওয়া হয়নি। কমিশনের বক্তব্য আমরা জানতে পারলাম না, যা অতীতে হয়নি। অতীতে বামফ্রন্ট সরকার আমাদের কমিশনের রিপোর্ট দিত, আমরা তা আলোচনা করে সরকারের সাথে বসে আমাদের বক্তব্য বলার সুযোগ পেতাম। তারপর বিজ্ঞানসম্মতভাবে কমিশনের বর্ধিত বেতন চালু হত। অথচ হারে বেতন কমিশনের কি সুপারিশ ছিল, আর কি চালু করা হল, কিছুই জানতে পারলাম না। বাড়ি ভাড়া ভাতা ১৫ শতাংশ থেকে ১২ শতাংশ করা হল। মহার্ঘভাতা ও এরিয়ার ছাড়া বেতন কমিশন চালু করা হল। ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে। ধর্মঘট করলে একদিনের বেতন কাটা ও ডায়াস নন করা হয়। ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়াই করলে F.I.R করা হয়। টিফিনের সময় ব্যক্তিগত সময়ে আন্দোলন করার ফলে সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক এবং একাধিক পদাধিকারী সহ ১৫ জনকে দার্জিলিং, কালিম্পঙ ও মুর্শিদাবাদ জেলার দূরদূরান্তে প্রতিহিংসা পরায়ন বদলী করা হয়েছে। আসলে সরকার ন্যায্য আদায়যোগ্য দাবি নিয়ে যুক্তি-তর্কে পারবে না, অর্থাৎ যুক্তি নেই তাই সামনা সামনি বসতে ভয় পাচ্ছে। ক্ষমতা আছে বদলী করেছে। আসলে সরকার ভয় পেয়েছে, তাই ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে।

চুক্তি প্রথার ও এজেন্সি প্রথার কর্মচারীদের ব্যাপক শোষণ চলছে। আমরা চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মতো সুযোগ সুবিধা প্রদানের জন্য লড়াই করছি এবং ষষ্ঠ বেতন কমিশনে দেওয়া মেমোর‍্যান্ডমেও আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলেছি। রাজ্যের কর্মপ্রার্থী যুবক যুবতীদের স্বার্থে প্রশাসনের অভ্যন্তরে লক্ষাধিক শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে আমরা সংগ্রাম আন্দোলন জারি রেখেছি। এখন বলা হচ্ছে শূন্য পদ পূরণ করা হবে না, স্নাতক স্তরের পড়ুয়াদের ইন্টার্ন হিসাবে নিয়োগ করা হবে। ৫০০০ টাকা করে ভাতা দেবে, চরম শোষণ চলবে। তাই আমাদের অতীত ঐতিহ্যকে বহন করেই সাহসিকতার সাথে পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্য সরকারকে উপযুক্ত জবাব দিতে এবং দাবি মেনে নিতে রাজ্য সরকারকে বাধ্য করতে আগামী ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ দু'দিন ধরে রাজ্যের প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দিয়ে সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার লক্ষ্যে সর্বত্র প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। □

তৃতীয় পৃষ্ঠার পরে

প্রসঙ্গ ঃকেন্দ্রীয় বাজেট ২০২২-২৩

জনবিরোধী সরকারও অস্বীকার করতে পারে না, সেখানেও বর্তমান সময়ে খরচের যে হার, তার থেকে বেশি বরাদ্দ করা হয়নি। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ অতিমারির সময় পড়াশুনার যে বিপুল ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করার জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করেছে। ভারতে এই সমস্যাটি, স্কুল ও কলেজ হঠাৎ করেই এবং দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে, আরও বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিল। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার অতিমারির সময়ে শিক্ষার জন্য খরচ প্রকৃত প্রস্তাবে কমিয়েই দিয়েছিল। এবারের বাজেটে যে সামান্য পরিমাণ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে, তা দিয়ে কোনোভাবেই বিপুল প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা সম্ভব হবে না। বিপরীতে, যথেষ্ট সংখ্যক প্রশিক্ষিত শিক্ষক সহ জনসাধারণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা না করে বিকল্প হিসেবে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে শিক্ষার কথা বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির পরিবর্তে বাজেটে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বর্ধিত মূলধনী বিনিয়োগের ওপর; যার অবশ্য প্রয়োজনও রয়েছে। কিন্তু এই ধরনের বৃহৎ পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলিতে শুরুতে শুধুমাত্র সেই সমস্ত সংস্থাগুলিই উপকৃত হবে, যাদের সরকারী প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা রয়েছে—এবং তারা হল সেই সংস্থাগুলি যারা সমসাময়িক বছরগুলিতে সরকারী নীতির মাধ্যমে অতিরিক্ত সুবিধা লাভ করেছে।

মনে রাখতে হবে, জাতীয় বিপর্যয়ের এই সময়কালেও, একটি ক্ষুদ্র অংশ এতটাই বেশি লাভ করেছে যে 'ওয়ার্ল্ড ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২' এবং 'অক্সফ্যাম ইনইক্যুয়ালিটি রিপোর্ট ২০২২'-এ আয় ও সম্পদের অন্যতম বৃহৎ বৈষম্য বৃদ্ধির দেশ হিসেবে ভারতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। যে অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান ও গণভোগের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে বিশেষ উপকৃত ক্ষুদ্র অংশ, চাহিদা সৃষ্টির নতুন উৎস তৈরি না হলে, অচিরেই অসুবিধায় পড়বে। নির্বাচনী বন্ডের ক্রেতাদের দ্রুত লাভের পথ তৈরি করার জন্য এইখানেই বর্ধিত মূলধনী বিনিয়োগ বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

এই ধরনের আর্থিক পরিকল্পনা, একেবারে বিকৃত গণতন্ত্র ছাড়া অন্য কোথাও কল্পনা করা কঠিন। এখন দেখতে হবে এই ধরনের অজ্ঞতাপূর্ণ অসম আর্থিক নীতি মধ্যবর্তী সময়ে কতখানি কার্যকরী হয়। □

[অনুবাদ সুমিত ভট্টাচার্য ঃ সৌজন্য স্বীকার : দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২২]

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিপালন

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মহিলারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হচ্ছেন, শোষিত-লাঞ্ছিত হচ্ছেন একই সঙ্গে এর বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল হচ্ছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আর এস এস পরিচালিত বি জে পি সরকার আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি করছে যার একমাত্র লক্ষ্য হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অংশের মানুষ যেমন আন্দোলন সংগঠিত করছেন, তেমনি সংগঠিত ক্ষেত্রের সঙ্গে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মহিলারাও লড়াইতে সামিল হয়েছেন। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা দেখলাম আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আনিস খান-এর হত্যার সুবিচার চাইতে গিয়ে যুবক-যুবতীরা প্রশাসনের নির্মম আক্রমণের শিকার হলেন। প্রকৃত খুনীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে রাজ্যের সরকার যুব আন্দোলনের নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জী সহ ১৬ জন ছাত্র-যুব আন্দোলনের কর্মীকে জেলের গারদে আটকে রাখে। এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণআন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের আন্দোলন-সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় মহিলা উপসমিতির আহ্বায়ক সুতপা হাজরা বলেন বর্তমান বছরে ৮ মার্চ আমরা যখন ১১২তম আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে এই সভায় মিলিত হয়েছি, তখন গোটা দেশজুড়ে চলছে ধর্ম নিয়ে উন্মাদনা। ধর্ম সংসদের নামে মুসলীম মহিলাদের নিলামে তোলার নিদান দেওয়া হচ্ছে। হিজাব নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, মেয়েদের পোষাক নিয়ে ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। গোটা দেশজুড়ে চলছে প্রবল আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তাই আনিস খানের মৃত্যুর বিচার চাইলে জেলে যেতে হয়। আগামী ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ দেশজোড়া ধর্মঘটে শাসককে এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে।

সভার মূল আলোচক দীপ্সিতা ধরকে সাধারণ সম্পাদক সম্বর্ধিত করার পরবর্তীতে এদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু "ধর্মতন্ত্রীদের শৃঙ্খল ভাঙার লড়াই"-এর ওপর আলোচনার শুরুতেই ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আলোচক সকলকে অভিনন্দন জানান। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য সরকারের মদতে সক্রিয় প্রোমোটার চক্র

করা হয়নি। উপরন্তু 'আলিপুর উন্নয়ন প্রকল্প'-র নামে হেরিটেজ বিল্ডিং ও সংলগ্ন বিশাল জমিকে বেসরকারী প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই পরিকল্পনা যে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে, তা হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশীষ সেন নিজেই এক চিঠির মারফৎ জানিয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিবকে। চিঠিটি তিনি লেখেন এ বছরের ৪ জানুয়ারি। সরকারী নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষায় সরকারী প্রেস গুরুত্বপূর্ণ---এই ভাবনাটও প্রোমোটারদের প্রতি সদয় সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বি জি প্রেস ও তার শ্রমিক-কর্মচারীদের পেশাগত নিরাপত্তার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও ঐ দপ্তরের সচিবকে চিঠি দিয়ে বি জি প্রেসকে ধ্বংসের প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আবেদন জানানো হয়েছে প্রেসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছেও। গত ১৯ জানুয়ারি প্রেস চত্বরে এক বিক্ষোভসভা থেকেও সরকারের কাছে প্রোমোটার চক্রের ফাঁদে পা না দেওয়ার বার্তা পাঠানো হয়। বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ ঐ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠন লাগাতার প্রতিবাদ জারি রেখেছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও গত ৮ মার্চ মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বি জি প্রেসের যন্ত্রাদি সরস্বতী প্রেসে স্থানান্তর এবং এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন দপ্তরে রি-ডিপ্লয়মেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০ মার্চ 'হিডকো'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক পত্র মারফৎ (পত্র নং ৬৯২/হিডকো/অ্যাডমিন/৩৯১৫/২০২১) শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব একথা জানিয়েছেন। ঐ পত্রে যন্ত্রাদি দ্রুত স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সরকারকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে। বহু মূল্যের সরকারী জমি প্রোমোটার চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ না হলে, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে এই দুটি সংগঠন। □

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

প্যারি কমিউনের আদর্শ অবিনশ্বর

ও মজুরীর হার সর্বস্তরের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। সরকারী কর্মচারী ও সাধারণ শ্রমিকদের বেতন এক করা হয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। সরকারী পরিষেবাকে আরো বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এই সময়ে আইন ও প্রশাসন যাতে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সঠিক আইন ও প্রশাসন জনস্বার্থে কাজ করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যাতে দায়িত্ব থেকে অপসারিত হন সেই মতো আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। পুরানো সেনাবাহিনীর বদলে নতুন সেনাবাহিনী তৈরি করা হয় যার প্রধান অংশ ছিল শ্রমিকরা। রাষ্ট্র ও শিক্ষা থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়। গীর্জা ও চার্চের সমস্ত সম্পত্তি ও অর্থ বাজেয়াপ্ত করে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। পৌরসভার বন্ধকী দোকানে বাঁধা দেওয়া মালের বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। সমবায় সমিতি গঠন করে শ্রমিকদের সংগঠিত করা ও কারখানাগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অপরদিকে ভার্সাই শহরে পালিয়ে আশ্রয় নেওয়া তিয়েরের নেতৃত্বে বুর্জোয়াদের জাতীয় সরকার ও তাদের সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত শক্তি অর্জন করছিল এবং প্যারিস দখলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। যে সব ফরাসী সৈন্য প্রুশিয়ানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল প্রুশীয় সরকার তাদের কমিউনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ফেরত দেওয়ার পর তাদের ব্যবহার করা হল প্যারিস দখলের যুদ্ধে। ২১ মে তারা প্যারিসে প্রবেশ করে। নগর কুশানে কমিউনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী ও সাধারণ জনগণ, এমনকি মহিলারাও রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলে তীব্র মরণপন প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ৮ দিন ধরে তীব্র লড়াইয়ে পর কমিউনের পতন ঘটে। কমিউনকে রক্ষার জন্য প্যারিসের জনগণ ও শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম পরাস্ত হয়। তারপর পুরো এক সপ্তাহ ধরে রক্তস্নাত প্যারিসে নিরস্ত্র নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুদের গণহত্যা শুরু হল। যখন দেখা গেল পাইকারি হারে হত্যা করা সম্ভব হচ্ছে না—তখন নির্বিচারে গ্রেপ্তার করে বড় বড় বন্দী শিবিরে পাঠানো হল। প্যারী কমিউন রক্ষার লড়াইয়ে অংশ নেওয়া ২০ হাজারের বেশি কমিউনার্ডদের হত্যার পর ফরাসী বুর্জোয়াদের নেতা তিয়ের দম্ভভরে হুঙ্কার দিলেন—"সমাজতন্ত্রকে শেষ করে দিয়েছি।"

ক্ষমতা দখল ও কমিউন গঠনের পর ৭২ দিন পরেই এই কমিউন পরাস্ত হয়। বিশ্বে প্রথম প্রলেটারিয়েটের নেতৃত্বে প্যারিসে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন কারণে তা কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি। প্রথমত কমিউনের নেতৃত্বের মধ্যে কিছু দর্শনগত বিভিন্নতা ছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ লুই মিশেলের দর্শনের অনুগামী ছিলেন, কেউ বা নৈরাজ্যবাদী লুট ব্লাঙ্কির দর্শনের অনুগামী, আবার কেউ কেউ কার্ল মার্কসের অনুগামী ছিলেন। তাই নেতৃত্বদের মধ্যে দূরদর্শী, পরিকল্পিত ও সুস্পষ্ট কর্মসূচীর অভাব ছিল।

দ্বিতীয়ত; শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রীর অভাব ছিল। ফরাসী কৃষক আক্রান্ত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়নি। তৃতীয়ত; সর্বহারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম একটি বিপ্লবী পার্টি ও সংগঠন তৈরি করা হয়নি। শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ততার উপর কমিউনার্ডরা নির্ভর করেছিল। চতুর্থত; বিভিন্ন বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম স্তম্ভ ব্যাঙ্ক, শ্রমিকরা দখল কলে নি। ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় দখল বুর্জোয়াদের হাতেই ছিল। পঞ্চমত; বুর্জোয়া সরকার যখন শ্রমিকদের প্যারিস দখলের পর ভার্সাইতে পালিয়ে গেল তখন পিছু ধাওয়া করে তাদের আত্মসর্মপনে বাধ্য করা উচিত ছিল। তাহলে তারা পরে শক্তি সঞ্চয় করে কমিউনকে আক্রমণ করতে পারত না। ষষ্ঠত; কমিউন বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রকে ভেঙে ফেলেনি। এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস তার "লুই বোনাপার্টির অষ্টাদশ ব্যুমেয়ার' গ্রন্থে বলেছিলেন—"কোনোভাবেই রাষ্ট্র যন্ত্র দখল করে শুধুমাত্র কিছু পরিবর্তন করে শোষণ পাটানো পাল্টানো সম্ভব হবে না। এই ব্যবস্থা ও আগের রাষ্ট্রের কাঠামোকে পুরোপুরিভাবে ভেঙে ফেলতে হবে। পরাস্ত হলেও প্যারি কমিউন তৎকালীন পুঁজিপতিদের মনে প্রবল ভয় ধরাতে সক্ষম হয়েছিল। সারা পৃথিবীকে কমিউনার্ডরা এই স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছিল যে শোষিত ও অত্যাচারিত শ্রেণীর অধিকার ও ক্ষমতা আছে দুনিয়া জয় করার। তারা এক নতুন ধরনের সামাজিক ব্যবস্থার স্বপ্ন মানুষকে দেখিয়েছিল, যেখানে কোনো শ্রেণীগত বৈষম্য থাকবে না এবং সর্বোপরি যেখানে শ্রেণীর অস্তিত্ব থাকবে না। তাই ১৫০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও প্যারি কমিউনের ঘটনাবলী পৃথিবীব্যাপী শোষিত মানুষকে আলোর পথ দেখাচ্ছে। লেনিন সঠিকভাবেই বলেছিলেন, 'কমিউনের মৃত্যু নেই, এ আদর্শ অবিনশ্বর।' □

লেখক প্রাক্তন সহ সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

বৃত্ত বাড়াও, বন্ধু বাঁড়াও, চেতনা বাঁড়াও

এখনকার ভারত। টার্গেট সেই মেয়েরাই এবং তাদের শিক্ষার অধিকার। এক দেশ নিদান দেয়, স্কুলে যেতে হলে হিজাব পরতেই হবে। আর এক দেশের আদেশ স্কুলে ঢুকতে হলে হিজাব খুলতেই হবে। দুটোই ফতোয়া—জোর করে চাপিয়ে দেওয়া, দুটোরই প্রতিবাদ দরকার। শুধু আফগানিস্তান কেন আমাদের দেশের কাশ্মীরের এক মেধাবী ছাত্রীকে হিজাব না পরার জন্য হেনস্থার শিকার হতে হয়। বিজেপি শাসিত কর্ণাটকের সরকারী নির্দেশিকা শুধু হিজাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। হিন্দু বনাম মুসলিম ছাত্রছাত্রীতে পরিণত হয়েছে। 'জয় শ্রীরাম' আর 'আল্লা হু আকবর'-এ ভাগ হয়ে গেছে। বিভাজনকারীরা ঠিক এটাই চেয়েছে। সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া স্কুলের ছেলেমেয়েরা সহপাঠিনীর পোশাক নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে পড়ে কিভাবে যদি বাইরে থেকে উস্কানি এবং মদত না থাকে। আজকের এই সমস্যাটি শুধু হিজাব পরা মুসলিম ছাত্রীদের সমস্যা মনে করে চুপ থাকলে চলবে না, কাল অন্য কোনো রাস্তা ধরে মেয়েদের উপর আঘাত আসতেই পারে। যেভাবে আঘাত এসেছিল মেয়েদের জিন্স পরা, মোবাইল ব্যবহার করা কিংবা পার্কে বসে থাকা নিয়েও। শুধুমাত্র বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের মহিলারা যে এই ফ্যাসিস্টদের আক্রমণের লক্ষ্য, সেটা মনে করার কোনো অবকাশ নেই। আজকের কর্ণাটকের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। হিন্দি বলয়ের বেকার যুবক যুবতীরা যখন রেলের গ্রুপ ডি এবং এন টি পি সি নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করল, তখন উত্তরপ্রদেশের ভোটকে সামনে রেখে শাসককুল সুপরিকল্পিতভাবে সব কিছুকে হিন্দু মুসলমানে ফেরাতে চেষ্টা করল। তখন চাকরির দাবি 'হিজাব পরার অধিকার' ও 'হিজাব পরা বন্ধ হোক'-এর দাবিতে নেমে এল। এভাবেই বিভেদমূলক অস্ত্র দিয়ে বরাবর সম্প্রীতি ও ঐক্য নষ্ট করার চেষ্টা চলবে। তাতে সহজ হবে মানুষকে তার মৌলিক অধিকারের দাবি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। বিভাজনের শক্তিও জানে রুজির লড়াইটা তখনই জিতবে, যখন জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ থাকবে দেশ।

বাংলার বাতাবরণেও মানুষের অভিজ্ঞতায় ক্রমে ক্রমে তিক্ততার প্রকাশ ঘটছে। দীর্ঘ দু'বছর স্কুল বন্ধ থাকায় একটা বিরাট অংশের গ্রাম বাংলার ছাত্রীদের বিয়ে হয়ে গেছে, ছাত্ররা পরিণত হয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকে। বিধানসভা, কর্পোরেশন থেকে পুরভোট সর্বত্র নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। ক্যাব, ট্রেন এবং নির্বাচনে প্রার্থী—মহিলারা লুম্পেন বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত। স্বাভাবিক কারণেই নীতিহীনতা, রুজি-রুটির সঙ্কট, লুম্পেনরাজ, নৈরাজ্য, ভোট লুট, ফান্ড লুট, প্রকল্প লুট প্রতিদিন মানুষের সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। কৃষক, শ্রমিক, ক্ষেতমজুর থেকে শুরু করে ছাত্র সমাজ, অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মচারী সকলেই চারিদিকের চেহারা দেখে ক্ষুব্ধ। একই সঙ্গে রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলির ভূমিকাও কোলে চড়ার সাংবাদিকতা, খবর পড়ে না শংসাপত্র পড়ে বোঝা দায়। অনুপ্রেরণার প্রতিযোগিতায় কে বেশি আনুগত্য দেখাবে তার প্রতিযোগিতা চলে। জীবন জীবিকার সমস্যা পিছনে চলে যায়। এরাই শাসককুলের ইমেজ নির্মাণ করে। স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায় শাসনকার্য পরিচালনার একটা বৈশিষ্ট্য হল, একদিকে যেমন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়, তেমনই একই সাথে অধিকারহীনতাজনিত ক্ষোভকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কিছু পপুলিস্ট প্রকল্পের মাধ্যমে যৎকিঞ্চিত সুবিধা বিতরণ করে এক রক্ষাকর্তার ইমেজ নির্মাণ করা হয়। যে যে বিষয়গুলি রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের প্রাপ্য, যে বিষয়গুলি রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, তা যেন এক ব্যক্তির মহানুভবতার ফল হিসেবে দেখানো হয়। 'নাগরিক' হয়ে ওঠে 'প্রজা'। পশ্চিমবাংলায় বর্তমান সময়ে আর্থ-সামাজিক চালচিত্র এটাই। আক্রমণ বহুমুখী লড়াই কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। দেশের কৃষক আন্দোলনের সাফল্য আমাদের কাছে শিক্ষা দিয়ে গেছে লড়াই মানে যাবতীয় প্রতিকূলতার ব্যারিকেড ভাঙা, একসাথে ভাঙা, সকলে মিলে ভাঙা, প্রতিবাদকে প্রতিরোধের স্তরে উত্তীর্ণ করা। আন্দোলন-সংগ্রাম মারফত 'বৃত্ত বাড়াও', 'বন্ধু বাড়াও', 'চেতনা বাড়াও'—আজ বহুমুখী আক্রমণের সময়ে অন্যতম কাজের আহ্বান। শ্রেণী সংগ্রামেই সাফল্যই পারবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শ্রেণী সংগ্রামকে শক্তিশালী করার শপথ ঘোষিত হোক। □

ধর্মতন্ত্রীদের শৃঙ্খল ভাঙার লড়াই

দীপ্সিতা ধর

তিনি বলেন আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবী মহিলাদের নারী দিবস। কিন্তু খুব সুকৌশলে এ বিষয়টিকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রমজীবী বাদে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে পুঁজি গ্রহণ করল। আসলে পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়মেই পুঁজি যাকে বাদ দিতে পারে না তাকে আত্তীকরণ করে নেয়। তাই আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনটিকে ব্যবহার করে সে বিজ্ঞাপন দেয় মহিলাদের জন্য কেনাকাটা করলে বিভিন্ন সামগ্রীর ওপর ১০ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। কিন্তু যখন একজন নারী সেই সমস্ত পুঁজিপতিদের অধীনে কাজ করতে গিয়ে পুরুষের সমান অধিকার, সমবেতনের দাবি জানায়, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা উপেক্ষিত থেকে যায়। পুঁজির কাছে নারী শুধুই পণ্য, তাই বিজ্ঞাপনে, প্রচার মাধ্যমে কোথাও নারীর চোখ, কোথাও হাসি, কোথাও দাঁত, কোথাও মুখকে ব্যবহার করে, তারা নারীকে ব্যবহার করছে। নারী দিবসের নামে তারা নারীত্বকে উদ্‌যাপন করছে, কিন্তু সমানাধিকার দিচ্ছে না। সমাজের বহু ক্ষেত্রে সমানাধিকারের প্রশ্নে এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে যেখানে পুরুষদের তুলনায় নারীরা অবহেলিত। ভারতবর্ষের পুরুষ ক্রিকেট দলের সদস্যরা যে পরিমাণ বেতন বা পারিশ্রমিক পান, মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্যরা তা পাননা। চলচ্চিত্র শিল্পেও এই উদাহরণ রয়েছে। সব থেকে বেশি এটা আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের নিজেদের বাড়িতে যেখানে গৃহবধূদের ক্ষেত্রে তিনি আমার মা হতে পারেন, আমার বোন হতে পারেন, আমার দিদি হতে পারেন, যিনি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দৈনন্দিন সংসারের কাজ নিঃশব্দে মুখ বুঁজে করে যান, কিন্তু এগুলিকে আমরা শ্রম বলে মনে করি না। মা-বোন-স্ত্রী-পুত্রবধূ তিনি যে পরিচয়েরই হোন না কেন বাড়িতে যে কাজটি তিনি বিনা বেতনে করেন, সেটি শ্রম নয়। কিন্তু একই কাজ যদি তিনি বাড়ির বাইয়ে গিয়ে করেন তাহলে সেটি কাজ হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তোরণের পরেও মহিলাদের শ্রমকে অদৃশ্য করার এই মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয়নি, আমরাও ভাবিনি।

মহিলাদের সমানাধিকারকে অস্বীকার করাই শুধু নয়, তাদের ওপর চলছে তীব্র শারীরিক-মানসিক আক্রমণ। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে যদি দেখি ২০১১ সালে তথাকথিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন একজন মহিলা। অনেকেই আপ্লুত হয়েছিলেন একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখে। কিন্তু আমরা দেখলাম পার্কস্ট্রীটে সুজেম জর্ডন-এর ঘটনা। তদন্ত শুরুর আগেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন সাজানো ঘটনা, তার সরকারকে ম্যালাইন করার জন্য এগুলো ঘটানো হচ্ছে, সুজেট-ই এই ঘটনার জন্য দায়ী। এর পরবর্তীতে এরকম আরও বহু ঘটনা ঘটেছে, যেখানে শিশু থেকে বৃদ্ধা বিভিন্ন অংশের মহিলারা আক্রান্ত হয়েছেন, আর মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের সুবিচারের বদলে নিজ মনগড়া বিষয় অবতারণা করেছেন। আমরা বলতে চাই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হলেই কি মহিলাদের সম্বন্ধে যা কিছু বলার অধিকার জন্মে যায়? মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হলেই কি তিনি মহিলাদের সম্বন্ধে যা খুশি বলতে পারেন, শুধুমাত্র তিনি মহিলা বলে—না তিনি তা পারেন না। ক্ষমতার অবস্থানকে ব্যবহার করে যা কিছু করা বা বলা যায় না। আমরা বলছি স্বৈরাচারী পুরুষ আর মহিলার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যে মুখ্যমন্ত্রী আর এস এস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মুখ হিসাবে নিজেকে পরিগণিত করতে চান, তিনি নিজ রাজ্যে গণতন্ত্র-গণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিসরকে ধ্বংস করছেন। আমাদের চোখে নরেন্দ্র মোদি আর মমতা ব্যানার্জীর মধ্যে একটাই পার্থক্য—একজন সাদা দাড়ি রাখেন, আরেকজন সাদা শাড়ি পরেন। গণতন্ত্র ধ্বংসের ক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশ আর পশ্চিমবঙ্গের কোনো পার্থক্য নেই। উত্তরপ্রদেশে যেমন প্রতিবাদী নিরীহ মানুষ জেলে যান, তেমনি পশ্চিমবঙ্গেও আনিস খানের হত্যার বিচার চাইলে মীনাক্ষিদের জেলে যেতে হয়। তারা ছাড়া পেয়েছে। আমাদের কাছে আনন্দের দিন কিন্তু এস এফ আই / ডি ওয়াই এফ আই-এর নেতৃত্বে এ আন্দোলন চলবে। উত্তর আধুনিকতাবাদ / পরিচিতি সত্তার রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। প্রচার মাধ্যমের দ্বারা ধারণা তৈরির চেষ্টা চলছে Progressive হতে হলে বিশেষ ধরনের পোশাক পড়তে হবে, নারীবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়কে অনুকরণ করতে হবে। কিন্তু আমরা বলছি—সমানাধিকারের প্রশ্ন তখনই প্রতিষ্ঠা পাবে, যখন একজন কৃষক রমনী

যখন ক্ষেতে কাজ করবে, তখন তার শিশুটিকে কাছের কোনো ক্রেশে রাখতে পারবে। সমাজের মূলধারার সঙ্গে নারীরাও এগিয়ে যেতে পারবে। বিকল্প নীতির মাধ্যমে একাজ সম্ভব। এক্ষেত্রে কেরালা রাজ্যের কিছু অভিজ্ঞতা বলছি। ওখানে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বেড়েছে। কেরালায় কুটুম্বশ্রী বলে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা / স্বচ্ছলতার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কেরালায় কমিউনিটি কিচেন শুরু হয়েছে যার মধ্য দিয়ে চাকুরীরতা মহিলারা মাসের শুরুতে টাকা দিয়ে তার বিনিময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবারের দুবেলা-তিনবেলার খাবার সংগ্রহ করছে। আলাদা করে বাইরে চাকুরী করে আবার বাড়ি ফিরেও শ্রম দিতে হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা জানি বেগম রোকেয়ার কথা যিনি শুধু নিজের শিক্ষা নিয়েই ভাবেননি, মহিলাদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসগর প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিরা নারী সমানাধিকার ও শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। নারীদের আদিবাসী মুসলমান, দলিত প্রভৃতি বিভিন্ন অংশে ভাগ করে তাদের ওপর বিভিন্ন কায়দায় অত্যাচার চালানো হয়েছে যুগ যুগ ধরে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পূর্বতন ত্রিভাঙ্কুর রাজ্যের একজন অন্ত্যজ নারীর প্রতিবাদ যা আমাকে প্রেরণা জোগায়। একসময় ত্রিভাঙ্কুর রাজ্যে নিয়ম ছিল অন্ত্যজ নারীদের উর্ধ্বাংশ ঢাকা যাবে না। কিন্তু নাম্বিলী নামের এক অন্ত্যজ পরিবারের বধূ তার উর্ধ্বাংশ বস্ত্র দ্বারা ঢেকে রাস্তায় বের হয়। এর জন্য রাজপেয়াদা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে জরিমানা করে। কিন্তু নাম্বিলী তা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় পেয়াদা তাকে আটকে রাখে। রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে নাম্বিলী তার বক্ষ থেকে স্তনযুগল কেটে প্রতিবাদ স্বরূপ রাজ্যপেয়াদার হাতে দেয়। পরবর্তীতে সে মারা যায়। তার এই ঘটনায় সকলে হতবাক হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই প্রথা রদ হয়।

এখন প্রশ্নটা এটা যে যন্ত্রণা পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ কী? Structural Change কিভাবে হবে? কারণ নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের চ্যালেঞ্জ বহু গুণ বেড়ে গেছে। মনুবাদে বিশ্বাসী আর এস এস মনে করে মেয়েরা জন্মায় পুরুষের সেবা করতে। জন্মের পর পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে সে থাকবে। পুত্র-সন্তান জন্ম দেওয়াই তার একমাত্র কাজ না হলে বংশে বাতি দেওয়ার কেউ থাকবে না। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখন্ডে প্রতিনিয়ত কন্যাভ্রূণ হত্যা চলছে। মহিলারা আক্রান্ত ধর্ষিতা হলে দোষ হচ্ছে মেয়েদের। সে তার বয়স তিন বছর হোক বা তিনি আশি বছরে বৃদ্ধা হোন। উত্তরপ্রদেশের উন্নাও বা কুলদীপ সেনগারের ঘটনা আমরা দেখেছি। মনুবাদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমরা জানি ফ্যাসিবাদী মনুবাদীরা নারীবিদ্বেষী হয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক আক্রমণ চলছে। চাকুরীর বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। স্থায়ী চাকরী থাকবে না আর নাগরিকরা প্রতিনিয়ত ভয়ে থাকবে তা সে চাকুরি বাঁচানোর হোক বা দাঙ্গার ভয়ে হোক বা মেয়েদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গে হোক। আমাদের দাসে পরিণত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আমরা জানি ফ্যাসিবাদের যেমন ইতিহাস রয়েছে, তেমনি শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়েরও দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। তাই তথ্য প্রযুক্তির কর্মচারীরা সংগঠিত হচ্ছে, Zomato-Swiggyee-র ডেলিভারী বয়রা সংগঠন তৈরি করছে, ওলা-উবের চালকরা Organisation গড়ে তুলছেন। রাষ্ট্রযন্ত্র, পুলিশ, আদালত যতই আন্দোলন দমনে তৎপর হোক শ্রমজীবীদের লড়াইতে প্রতিদিন অনেক বেশি নতুন নতুন হাত যুক্ত হচ্ছে। নয়া শিক্ষানীতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে গ্রামের ছোটো স্কুল তুলে দিয়ে শহরে স্কুল গড়ার। স্বাভাবিকভাবেই দূরত্বগত কারণে ছাত্রীদের ড্রপ আউট-এর সংখ্যা বাড়বে। আগে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ এসসি/এসটি ছাত্রীদের স্কলারশিপের ব্যবস্থা, যা এবারের বাজেটে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। Post Doctorate-এর ক্ষেত্রে স্কলারশিপ বন্ধ। এক কথায় বর্তমানে যখন ৪০ শতাংশ মেয়েরা শিক্ষিত হচ্ছে উচ্চশিক্ষায় তা আরও কম। তাকে আরও হ্রাস করার চেষ্টা চলছে। এস এফ আই / ডি ওয়াই এফ আই-এর বিরুদ্ধে লড়াই চালাবে। আপনারাও এই আন্দোলনে সামিল হবেন এ বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। হুমকি থাকবে, আক্রমণ থাকবে, শারীরিকি নিগ্রহ থাকবে—কিন্তু ইলা মিত্র, কল্পনা দত্তদের ত্যাগ-লড়াই আন্দোলনের মানসিকতার বিষয়টিও আমাদের মনে সাহস জোগাবে। আমাদের বিশ্বাস যে রাজনীতি মতাদর্শে আমরা বিশ্বাসী সেই রাজনীতি মতাদর্শের সঙ্গে আমরা কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। একই সঙ্গে আমাদের সকল প্রগতিশীল পরিবারের নারীদেরকে কুর্ণিশ জানাই যারা মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সভার পরিসমাপ্তির পূর্বে মূল আলোচক উপস্থিত সকলের অনুরোধে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। □

সমিতি সম্মেলন

গত ৫-৬ মার্চ, ২০২২ তারিখে কোচবিহার জেলার কর্মচারী ভবনে কমরেড পদ্মেশ্বর সাহা মঞ্চ ও কমরেড সুকোমল কর্মকার নগরে রাজ্য সম্মেলন হয়।

সম্মেলনের শুরুতেই একটি বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত মিছিল ৩০ মিনিট ধরে কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে কর্মচারী ভবনে শেষ হয়। তারপর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে মাল্যদান কর্মসূচী সমাপ্ত করে প্রতিনিধিগণ শ্লোগান মুখরিত করে সম্মেলনের মূল মঞ্চে প্রবেশ করেন। মূল অনুষ্ঠান শুরু করার পূর্বে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কোচবিহার জেলার সাংস্কৃতিক টীম সঙ্গীত পরিবেশন করে। তাপস দাস, ডালিম অধিকারী ও শ্যামল দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করে। প্রথমেই শোক প্রস্তাব পাঠ ও নিরবতা পালন হয়। তারপরে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি আশীষ গোস্বামী তার স্বাগত ভাষণ দেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন অভিজিৎ বোস দপ্তর সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক দেবাশীষ রায়, তারপর ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কোচবিহার জেলার সম্পাদক প্রণয় কাজী ও অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি ধীরাজ রায়। কমরেড ত্রিদিব নন্দীর নামে প্রগতিশীল পুস্তক বিপণি কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন আশীষ গোস্বামী। মোট ৩৬০০ টাকার বই বিক্রী হয়। প্রতিবেদন পাঠ করেন যুগ্ম সম্পাদক উৎপল রাজবংশী, খসড়া প্রস্তাব পাঠ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত পাটনী ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ নিরঞ্জন মণ্ডল এবং সংবিধান সংশোধনী ও সংযোজনী সংক্রান্ত প্রস্তাব পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক উদয় মল্লিক। প্রতিবেদনের উপর ১৩ জন আলোচনা করেন ও সমিতির প্রবীণ নেতৃত্ব অরুন চক্রবর্তী সংগঠনের কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ২৮-২৯ মার্চ ২০২২ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাবক গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিন সম্মেলন মুলতুবির পরে কোচবিহার জেলার সাংস্কৃতিক টিমের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, যা উপস্থিত সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। সমস্ত বক্তব্য গুটিয়ে জবাবী বক্তব্য রাখেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অর্জুন মান্ন। সমস্ত প্রস্তাব সমর্থনের পর ৪২ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সভাপতি তাপস দাস, সাধারণ সম্পাদক উৎপল রাজবংশী দুই জন যুগ্ম সম্পাদক উদয় মল্লিক, কৃষ্ণকান্ত পাটনী ও নিরঞ্জন মণ্ডলকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হয়। □

সমিতি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির ৪৮তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন গত ১২-১৩ মার্চ, ২০২২ কমরেড প্রবীর সরকার ও কমরেড রতন দাস নগর (বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা), কমরেড অমল গাঙ্গুলী মঞ্চে (কর্মচারী ভবন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনের শুরুতে প্রতিনিধিদের একটি দৃপ্ত মিছিল শহর পরিক্রমা করে। রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রণব কর। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন রাখেন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক গৌরহরি পাত্র, আয় ও ব্যয়ের হিসাবে রাখেন কোষাধ্যক্ষ নীরব দত্ত। প্রস্তাবাবলি রাখেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক প্রদীপ ঘোষ, সমর্থন করেন সংগঠন সম্পাদক কল্লোল ভট্টাচার্য। ২৮-২৯ মার্চ, ২০২২ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব উত্থাপন করেন সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ফিরোজ আহমেদ। সমর্থন জানান সমিতির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুখেন্দু সরকার। সম্মেলনে তিনজন মহিলা প্রতিনিধি সহ ২১ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। জবাবী ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামাণিক। সম্মেলনে আব্দুল মান্নাফ প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা প্রতাপ মুখার্জী। উক্ত বিক্রয় কেন্দ্র থেকে ২১০০০ টাকার বই বিক্রি হয়। সম্মেলনে 'সমিতির ইতিহাস' বইটির উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীন নেতা প্রবীর মুখার্জী। সমিতির মুখপত্র সংভরণের বিশেষ সংখ্যার প্রকাশ করেন সমিতি ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী। ক্রেডেনশিয়াল কমিটির তথ্য রাখেন অন্যতম সংগঠন সম্পাদক অলিকুল ব্যানার্জী। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিজ্ঞান আন্দোলনের নেতা সুফল সেন, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অশোক রায়চৌধুরী, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতীম গোস্বামী ও অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক বিপ্লব চক্রবর্তী। সম্মেলনে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার আর্থিকভাবে দুর্বল ও মেধাবী ছাত্রী রূপসা পাত্রকে আগামী দু'বছরের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের হিসাব, ধর্মঘট সহ প্রস্তাবাবলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলন সমাপ্ত হয়। সম্মেলন পরিচালনা করে সমিতির সভাপতি অনুব্রত সেনগুপ্ত এবং সহ সভাপতি উৎসর্গ মিত্র, শায়েমা বানু, তাপস মজুমদার ও গৌতম সাহাকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সম্মেলন থেকে উৎসর্গ মিত্রকে সভাপতি, অশোক প্রামাণিককে সাধারণ সম্পাদক ও ফিরোজ আহমেদকে কোষাধ্যক্ষ করে ৬৬ জনের শক্তিশালী কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
49th Year, 9th & 10th Edition, January-February 2022
Regd. No. : 18484/71

মুখ্যমন্ত্রীর অপমানজনক মন্তব্যের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে কর্মচারীদের বিক্ষোভ

গত ১১ মার্চ বিধানসভায় রাজ্য বাজেট পেশ হওয়ার পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অলরেডি অনেক দিয়েছি'। ওদের (কেন্দ্র) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আছে। আমার হাতে নোট ছাপানোর মেশিন নেই। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে স্পষ্ট, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা দেওয়ার কোনো সদিচ্ছা সরকারের নেই। এই মন্তব্যের কারণ রাজনৈতিক সদিচ্ছার চূড়ান্ত অভাব। আর্থিক অক্ষমতা নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার মহার্ঘভাতা প্রসঙ্গে নারাজ। অথচ তিনিই বিরোধী দলে থাকাকালিন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে ডি এ আপ-টু-ডেট করা হবে। মহার্ঘভাতার স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ করা হবে ইত্যাদি। কিন্তু ক্ষমতায় এসে ঠিক উল্টো পথে হাঁটছেন। এমনকি ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তা থেকে বোঝাই যাচ্ছে, আগামী অর্থবর্ষেও মহার্ঘভাতা দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নেই।

বীরভূম

উত্তর ২৪ পরগনা

পুরুলিয়া

মহাকরণ

নব মহাকরণ

মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। কখনও বলেছেন ডি এ বকেয়া নেই। আবার কখনও বলেছেন যখন পারব দেব। অথচ কর্মচারীরা মহার্ঘভাতার দাবি করলে, তাদের বিরুদ্ধে দূরদূরান্তে বদলি সহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মহার্ঘভাতা যে কোনো বেতনবৃদ্ধির দাবি নয়, এটি মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে বেতনের যে ক্ষয় হয়, তাকে রোধ করার একটি কার্যকরী ব্যবস্থা এবং কর্মচারীদের অর্জিত অধিকার—দেশব্যাপী স্বীকৃত এই সত্যটি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানতে প্রশাসনিক প্রধানের এই ধরনের অসত্য বক্তব্যের কারণে ব. া ে জ্য ব. কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটল গতকাল (১৪ মার্চ) সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটে বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান এবং শূন্যপদ পূরণের দাবিকে যুক্ত করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও অংশগ্রহণ করবেন। এই মর্মে গত ১০ মার্চ রাজ্যের মুখ্যসচিব সহ সমস্ত জেলা শাসককে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। □

লবণ হ্রদ

হাওড়া

২৮-২৯ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট

মুখ্যসচিবকে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান রাজ্য সরকারী কর্মীদের

বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস বা বি জি প্রেস শুধুমাত্র একটি প্রিন্টিং প্রেস নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মৃতিবিজরিত শতাব্দী প্রাচীন এই প্রেসটি স্বাধীনতার পূর্বে অবিভক্ত বঙ্গদেশের এবং স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি মুদ্রণের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ১৯১৮ সালে বর্তমান ঠিকানায় (গোপাল নগর, আলিপুর) এই প্রেসের কাজ শুরু হয় এবং ১৯৩৬ সালে এর আধুনিকীকরণ সম্পন্ন হয়। সেই সময় থেকেই ৪৫০ হাজার রয়্যাল অক্টাভো সাইজের কোনো বই একদিনের মধ্যে কম্পোজ, প্রিন্টিং এবং বাইন্ডিং করে ডেলিভারি করার ক্ষমতা অর্জন করে বি জি প্রেস। তখন বিশ্বের মাত্র ৩/৪টি প্রেসের এই ধরনের অত্যাধুনিক মুদ্রণ প্রযুক্তি ছিল। প্রতিষ্ঠানের মতোই বিপুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করছে এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বছরটিতেই দাবি আদায়ের জন্য মাসাধিককাল ধর্মঘট করেন এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। এটাই ছিল এদেশে সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘট। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ এই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। গত শতাব্দীর উত্তাল চল্লিশের দশকে দাবি আদায়ে পুণরায় ধর্মঘটে যান এই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীরা। দাবি আদায়ের আন্দোলনের পাশাপাশি, এই প্রেসটিকে এশিয়ার সর্ববৃহৎ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসের মর্যাদায় উন্নীত করার ক্ষেত্রেও এখনকার শ্রমিক-কর্মচারীরা ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনের উদাহরণযোগ্য ভূমিকা পালন পরেন। শ্রদ্ধেয় কমরেড মুজফ্ফর আহমেদও কিছুদিন এই প্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই প্রেসটিকে 'হেরিটেজ' মর্যাদায় ভূষিত করে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়।

কিছুদিন আগেও এই প্রেস থেকে লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৬/৭ কোটি ব্যালট পেপার ছাপা হতো। এক রাতের মধ্যে রাজ্য বাজেটের সাড়ে সাত-হাজার পাতার বই ছাপতে পারত এই প্রেস। অথচ ২০১১ সালে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। শুরু হয় বিমাতৃসুলভ আচরণ। স্থায়ী নিয়োগ না হওয়ার ফলে কমতে থাকে শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা। ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে বার বার দাবি করা সত্ত্বেও প্রেসের আধুনিকীকরণ বা পর্যাপ্ত কাজ বরাদ্দ করা কোনোটিই হয়নি।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা এলাকার মধ্যে এই প্রেসটির অবস্থান। অথচ ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করার জন্য তাঁর পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। উপরন্তু 'আলিপুর উন্নয়ন প্রকল্প'-র নামে হেরিটেজ বিল্ডিং ও সংলগ্ন বিশাল জমিকে বেসরকারী প্রোমোটারদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই পরিকল্পনা যে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারে, তা হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশীষ সেন নিজেই এক চিঠির মারফৎ জানিয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিবকে। চিঠিটি তিনি লেখেন এ বছরের ৪ জানুয়ারি। সরকারী নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষায় সরকারী প্রেস গুরুত্বপূর্ণ---এই ভাবনাটও প্রোমোটারদের প্রতি সদয় সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেস ওয়ার্কাস ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বি জি প্রেস ও তার শ্রমিক-কর্মচারীদের পেশাগত নিরাপত্তার জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও ঐ দপ্তরের সচিবকে চিঠি দিয়ে বি জি প্রেসকে ধ্বংসের প্রক্রিয়া থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আবেদন জানানো হয়েছে প্রেসের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছেও। গত ১৯ জানুয়ারি প্রেস চত্বরে এক বিক্ষোভসভা থেকেও সরকারের কাছে প্রোমোটার চক্রের ফাঁদে পা না দেওয়ার বার্তা পাঠানো হয়। বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সহ ঐ প্রতিষ্ঠানের সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠন লাগাতার প্রতিবাদ জারি রেখেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও গত ৮ মার্চ মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে বি জি প্রেসের যন্ত্রাদি সরস্বতী প্রেসে স্থানান্তর এবং এখানকার শ্রমিক-কর্মচারীদের বিভিন্ন দপ্তরে রি-ডিপ্লয়মেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১০ মার্চ 'হিডকো'র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এক পত্র মারফৎ (পত্র নং ৬৯২/হিডকো/অ্যাডমিন/৩৯১৫/২০২১) শিল্প পুনর্গঠন দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব একথা জানিয়েছেন। ঐ পত্রে যন্ত্রাদি দ্রুত স্থানান্তরের কথা বলা হয়েছে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও বি জি প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং সরকারকে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছে। বহু মূল্যের সরকারী জমি প্রোমোটার চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ না হলে, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে এই দুটি সংগঠন। □

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।